টমাস মান্ এস্টেটস্-এর সত্বাধিকারিণী
শ্রীমতী ক্যাটেরিনা মান্-এর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া-র পক্ষে তরুণ সেনগুপ্ত কর্তৃক
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত
মুদ্রক : সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬
প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং, কলিকাতা ৯
প্রচ্ছদ মুদ্রক : নিউ প্রাইমা প্রেস, কলিকাতা ১৩

জুলাই, ১৯৬০

॥ এক ॥

ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব সুমন্ত্র নামক গবাদিপশু-পালকের কন্যা সুশ্রোণীযুতা সীতা ও তদীয় তথাকথিত দুইজন পতির এই প্রণয়কাহিনীর সহিত রক্তপাতাদি এমন সকল রোমহর্ষক ঘটনা বিজড়িত যে, শ্রোতার চিত্তে যথোপযুক্ত শক্তি ও সাহস না থাকিলে মায়ার বীভৎস ছলনার দ্বারা তাহার মন মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এই গল্প যিনি শ্রবণ করিতে চাহেন উপাখ্যানকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। এরূপ কাহিনী শ্রবণের জন্য যতটা নহে, কথনের জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক সাহসের প্রয়োজন। এই কাহিনীর ঘটনাবলী আদ্যন্ত যেরূপ ঘটিয়াছিল, অবিকল সেইরূপ বলিতেছি। এক্ষণে অবধান করুন :

তান্ত্রিক পূজার পানপাত্র যেরূপ শোণিত কিংবা কারণবারি দ্বারা অল্পে অল্পে পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহা যে সময়ের ঘটনা তখন মানুষের মনে বিগতযুগের স্মৃতি সেইরূপ অল্পে অল্পে ভরিয়া উঠিতেছিল। নিয়ম-নিষ্ঠার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া তখন পিতৃশাসিত সমাজের অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী আদিম যুগের বীজ। পুরুষ হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হইল প্রকৃতির প্রতি। ফলে শক্তিসাধনার প্রাচীন প্রতিমাগুলিতে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার ঘটিল। জীবধাত্রী জননীর পূজার উদ্দেশ্যে বসন্ত-সমাগমে নানা দিগ্-দেশ হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রী তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। দেশের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় দুইটি তরুণ পরস্পরের সহিত আমরণ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। জাতি ও বয়সে উভয়ের মধ্যে বিশেষ তারতম্য না থাকিলেও আকৃতি-প্রকৃতিতে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স যাহার, তাহার নাম নন্দ এবং বয়সে

যে সামান্য বড় তাহার নাম ছিল শ্রীদমন। নন্দের বয়স অষ্টাদশ, অপরজন একবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। যথাকালে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাদের বাসগৃহ ছিল কোশলদেশের অন্তর্গত ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট দেবমন্দির-সুশোভিত ধেনুকল্যাণ নামক একটি গ্রামে। গ্রামের চতুর্দিকে মনসার বেষ্টনী, তৎপার্শ্বে দারুময় প্রাচীর। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এই চারি দিকে চারিটি তোরণদ্বার। কিংবদন্তি এই যে সংযতবাক্ বাণীর বরপুত্র এক পরিব্রাজক ঋষি গ্রামবাসীগণের সেবায় তৃপ্ত হইয়া এই বর দান করেন যে চারিটি তোরণ-দ্বার নিত্য দুগ্ধ ও মধু ক্ষরণ করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই বন্ধুযুগলের মধ্যে যে গভীর প্রণয় ছিল তাহার অন্যতম কারণ হইল ইহাদের উভয়ের মনঃপ্রকৃতির বৈসাদৃশ্য। বিপরীত অহংভাবের দ্বারা চালিত হওয়ার ফলে ইহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে যাহা বিশেষ তাহার দ্বারা দুই ব্যক্তি বিশিষ্ট হয়। এই বিশেষ প্রভেদের হেতু, প্রভেদ হইতে উপমা সঞ্জাত হয়, উপমা হইতে চিত্তচাঞ্চল্য, চিত্তচাঞ্চল্য হইতে বিস্ময় ও বিস্ময় হইতে আশ্চর্যবোধ এবং পরিশেষে এই আশ্চর্যবোধ হইতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও দান প্রতি-দানের মধ্য দিয়া মিলনের সূত্রে গ্রথিত হইতে থাকে। এতৎ বৈ সদ্— এইরূপই নিয়ম। তরুণ বয়সে মানুষের প্রকৃতি যে উপাদানে গঠিত হয়, তাহা কুম্ভকারের মৃত্তিকার ন্যায় কোমল থাকে। অধিক বয়সে এই কোমলতা থাকে না, আপন বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তি তখন বিশেষ হইয়া উঠে। এইজন্য তরুণ বয়সে যত সহজে অপরের সহিত মানুষ মিলিতে মিশিতে পারে, অধিক বয়সে তত সহজে পারে না।

তরুণ শ্রীদমন ছিল বণিক্‌পুত্র বণিক। অপরপক্ষে নন্দ ছিল একাধারে কর্মকার ও গোপালক। তাহার পিতা গর্গ গোষ্ঠে ধেনু চরাইত, আবার অবসর পাইলেই হাপরে হাওয়া দিতে দিতে হাতুড়ি পিটাইতে বসিত। শ্রীদমনের পিতা ভবভূতির পিতৃকুল ছিল বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণবংশীয়। গর্গের চৌদ্দপুরুষের কেহ শাস্ত্র অধ্যয়নের ধার ধারে নাই। তথাপি ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে গর্গেরা শূদ্রবংশীয় নহে এবং ছাগনাসা হইলেও তাহারা যে বাস্তবিক মনুষ্যসমাজভুক্ত—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সে যাহাই হউক, কেবল শ্রীদমন কেন, তাহার পিতা ভবভূতির পক্ষেও ব্রাহ্মণত্ব স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। ভবভূতির পিতা ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বানপ্রস্থ কিম্বা সন্ন্যাস অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ন্যায় ভক্তিমান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দাক্ষিণ্যনির্ভর হইয়া দিনাতিপাত করা তাঁহার কাম্য ছিল না। বোধকরি এইরূপ উঞ্ছবৃত্তিতে তাঁহার সন্তোষও ছিল না। তিনি তন্তুজ পরিধেয় বস্ত্র, কর্পূর ও চন্দন কাষ্ঠের ব্যবসায় হইতে বেশ কিছু উপার্জন করিতেন। তদীয় পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলে কি হয়, ধেনুমঙ্গল গ্রামে বণিগ্‌বৃত্তিই হইল তাহার উপজীবিকার অবলম্বন। গুরুর নিকট কিছুকাল ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও দর্শন পাঠ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভবভূতির পুত্র শ্রীদমন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গিয়া বণিক বনিয়া গেল।

গর্গপুত্র নন্দের বেলা জাতি ও বৃত্তিতে এই প্রকার নিদারুণ বৈষম্য দেখা দেয় নাই। ঐতিহ্য কিম্বা উত্তরাধিকারে তাহার এমন কিছু ছিল না যাহার সহিত জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির যৎসামান্য সম্পর্ক থাকিতে পারে। পূর্বজন্মার্জিত কর্ম তাহাকে প্রাকৃত জনগণের বংশে জন্ম দিয়াছিল। সে ছিল সহজ সরল সদানন্দ কৃষ্ণ গোপালের ন্যায় মাটির মানুষ। কৃষ্ণ তাহার কেশ, কৃষ্ণ তাহার বর্ণ। অনাবৃত তাহার বক্ষপটে রোমরাজি দেখিয়া মনে হইত যেন সুলক্ষণযুক্ত বৎসতরটি। কর্মকারের হাতুড়ি পিটাইয়া তাহার বাহু পেশল। বনেবাদাড়ে পশুচারণ করিতে গিয়া তাহার দেহ সৌষ্ঠবযুক্ত। সুঠাম দেহে সে নিয়মিত সর্ষপ তৈল মর্দন করিত। তৈলচিক্কণ শ্যাম অঙ্গে স্বর্ণাভরণ ও বন্যপুষ্পের মাল্য ধারণ করিতে ভালবাসিত। স্থূল ওষ্ঠ ও অজনাসা

হইলে কি হয়, অজাতশ্মশ্রু নন্দের প্রসন্ন বদনমণ্ডলে এবং হাস্য-উদ্‌ভাসিত ভ্রমর-কৃষ্ণ অক্ষিযুগলে এমন একটি সদানন্দ ভাব বর্তমান ছিল, যাহা পরিবেশের সহিত দিব্য মানাইত।

শ্রীদমনের এই শ্যামলকৃষ্ণ বন্ধুটিকে বড়ই ভাল লাগিত। বন্ধুর আকৃতি-প্রকৃতির সহিত সে আপন আকৃতি-প্রকৃতির তুলনা করিত। তাহার নিজের ত্বকের বর্ণ গৌর, কেশের রঙ কপিশ, মুখমণ্ডলের ডৌলও অন্যপ্রকার। উদ্যত খড়্‌গের ন্যায় সূক্ষ্ম তাহার নাসিকা, চক্ষুর দৃষ্টি কোমল, গণ্ডদেশে হালকা শ্মশ্রুর আভাস। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃঢ় পেশল ভাব একেবারেই নাই, বরঞ্চ ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা বৈশ্য করণিকের ন্যায় শিথিল কোমল ভাব। অপ্রশস্ত বক্ষোদেশ, কিন্তু পীন উদর, জানুবন্ধ ও পাদদেশ সুগঠিত। সর্বশুদ্ধ শ্রীদমনের শরীর দেখিলে মনে হয় যে তাহার অধোদেশ শীর্ষদেশের পরিবাহক মাত্র; মুণ্ড মুখ্য, দেহ গৌণ। নন্দের বেলা কিন্তু অন্যরূপ, সে যেন দেহসর্বস্ব এবং তাহার সহাস্য বদনটি নিতান্তই যেন শরীরের পরিপূরক। মোটকথা, দুই বন্ধুকে দেখিলে মনে হইত মহাদেবের দুই বিগ্রহ—একজন যেন যোগিরাজ হইয়া দেবীর পদতলে মৃতকল্প শয়ান রহিয়াছেন, অন্যজন যেন পার্বতীর পাণিপ্রার্থী শংকর—দেবীর সম্মুখে তরুণ দেহের সমস্ত দীপ্তি প্রকট করিয়া দণ্ডায়মান।

কিন্তু বাস্তবিক মহাদেবের সত্তা তো এক—তিনি একাধারে জন্ম-মৃত্যুর অধীশ্বর। দেবীর সহিত যুক্ত হইয়া তিনি ইহকালে পর-কালে, বর্তমানে সনাতনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইহারা যেন শিবের দুই বিগ্রহ-স্বরূপ। নিজেদের ব্যক্তিস্বরূপে ইহাদের অনাগ্রহ। যদিচ ইহারা সম্যকরূপে জ্ঞাত আছে যে বিচিত্রের মধ্যে, বিশেষের মধ্যে সেই একেরই প্রকাশ—তথাপি পরস্পরের প্রভেদ বশতঃই যেন ইহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। শ্রীদমনের অধরোষ্ঠ সূক্ষ্ম, চিবুকে তাহার কোমল কপিশ বর্ণের শ্মশ্রু। নন্দের আকৃতি-প্রকৃতি, আদিম, বর্বরোচিত। তাহার স্থূল অধর ও ঘনকৃষ্ণ বর্ণে শ্রীদমন এমন কিছু পাইত যাহা

তাহার কৌতূহল ও আনন্দের বিষয়। অপরপক্ষে নন্দের পক্ষে শ্রীদমনের সাহচর্য গর্বের বিষয়। তাহার গৌর কান্তি, সুগঠিত মস্তক এবং বিদগ্ধ-জনোচিত বাক্-নিপুণতায় নন্দ বিস্মিত বিমুগ্ধ। এইরূপে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হইতে লাগিল। নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি উপহাস-পরিহাসের ভাব যে একেবারে ছিল না, তাহা বলা চলে না। শ্রীদমনের স্ফীতোদর ও কপিশ বর্ণের কেশ, তাহার সূক্ষ্ম নাসা ও সাধু ভাষা লইয়া নন্দ পরোক্ষে হাসাহাসি করিত। অপর পক্ষে শ্রীদমনও বন্ধুর অনুচ্চ নাসিকা ও গ্রাম্যতা লইয়া পরিহাস করিতে ছাড়িত না। তুলনা উপমানের দ্বারা চিত্তে যে বিক্ষোভের উৎপত্তি হয়, এই সকল পরোক্ষ সমালোচনা সেই চিত্তবিক্ষেপের প্রকাশ। ইহা দ্বারা অহংভাবের তৃপ্তি হয় সত্য, কিন্তু অহংভাব হইতে বিপরীত প্রকৃতির সহিত মিলিত হইবার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেই মোহের নিবৃত্তি ঘটে না।

॥ দুই ॥

বিহঙ্গকুল-কলকাকলিমুখরিত সুন্দর মধুঋতু-সমাগমে নন্দ ও শ্রীদমন স্ব-স্ব কার্য উপলক্ষ্যে পদব্রজে একত্রে এক জনপদ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। পিতা গর্গের আদেশে নন্দ যাইতেছিল কিয়ৎ পরিমাণ লৌহ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে। বন্ধুদ্বয়ের নিবাস-স্থান ধেনুকল্যাণ গ্রাম হইতে কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর লৌহকারদের গ্রাম। ইহারা ইতর জাতি, মৃন্ময় কুটিরে থাকে এবং ইহাদের পরিধেয় বল্কল মাত্র। তবে লৌহ বিগলনের কর্মে ইহারা সুদক্ষ। নন্দ ইহাদের ভাষা জানে। কুরুক্ষেত্র নগরের নিকটবর্তী এই পল্লী। কুরুক্ষেত্র নগর আবার যমুনার তীরবর্তী বহুজন-অধ্যুষিত ইন্দ্রপ্রস্থের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। শ্রীদমনের গন্তব্যস্থল ছিল ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসী জনৈক সমব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট। বন্ধুটি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, ভবভূতির ন্যায় ইনিও গার্হস্থাশ্রমের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শ্রীদমনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের তন্তুবায়-রমণীদের হস্তে প্রস্তুত সুরঞ্জিত পরিধেয় উত্তরীয়াদির বিনিময়ে কয়েকটি উদূখল ও কিছু চকমকি সংগ্রহ করা। ধেনুকল্যাণ গ্রামে উভয় বস্তুর চাহিদা রহিয়াছে।

পুরা দেড় দিনের পথ অতিক্রম করিয়া বন্ধুদ্বয় চলিতেছে—কখনও জনপথ, কখনও মরুপ্রান্তর বা অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে। উভয়েই পৃষ্ঠদেশে স্ব স্ব পেটিকা বহন করিতেছে। নন্দের পেটিকায় আছে সুপারি, কপর্দক ও অলক্তকপত্র, লৌহের বিনিময়ে এই সকল বস্তু মূল্যস্বরূপ দিতে হইবে। শ্রীদমনের পৃষ্ঠে অজিনচর্মাবৃত তন্তুজ বস্ত্রাদি। ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্নমন্দির-সম্ভূতা জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী সর্বলোকাশ্রয়স্বরূপিণী মহাকালীর মন্দির পথে পড়িল। মন্দির-সংলগ্ন কুণ্ডের জল স্বর্ণমক্ষী নামক উচ্ছলস্রোতা পার্বত্য নদীর সহিত মিলিয়াছে

এবং তাহার চঞ্চলতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছে। স্বর্ণমক্ষী ও যমুনা নদীর সংগমে এই কালীতীর্থ। যমুনা যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে, সেই সংগমস্থল সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা এই সংগম স্থল হইতে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত। গঙ্গার তীরে তীরে কত মহাতীর্থ, কি বিচিত্র তাহাদের মাহাত্ম্য। এই সকল তীর্থে অবগাহন করিলে সকল কলুষ অপগত হয়। এই প্রাণ-গঙ্গার অভিষেকে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়। স্বর্গের মন্দাকিনী মহা-কাশে যেমন ছায়াপথের ন্যায় প্রসারিত, তেমনিই এই মর্ত্যের পুণ্য-তোয়া গঙ্গা নদী। এই নদীর তীরে তীরে তীর্থ, সংগমে সংগমে তীর্থ, এবং সকল তীর্থের সার হইল যেখানে গঙ্গা সমুদ্রের বক্ষে বিলীন হইয়াছে।

গঙ্গাযমুনার সংগমতীর্থের ন্যায় না হইলেও, পর্বতদুহিতা স্বর্ণমক্ষী যে-স্থলে যমুনার সহিত মিলিয়াছে তাহার স্থানমাহাত্ম্য উপেক্ষণীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে আর্যাবর্তের এই সমগ্র অঞ্চলটিই তীর্থে ও পীঠস্থানে পরিকীর্ণ। হোম যজ্ঞ পূজাপার্বণের সুযোগ এই অঞ্চলে সর্বসাধারণের আয়ত্ত। তীর্থের জলে স্নান পানের সুবিধার জন্য প্রত্যেক তীর্থে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী নির্মিত হইয়াছে। এই সকল ঘাটের অবস্থান হেতু জলজ উদ্ভিদ ও পদ্মমৃণালের জঞ্জালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে পূজারী ভক্তেরা শান্তগম্ভীরচিত্তে ধীরপদক্ষেপে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তীর্থে অবগাহন করিতে পারেন, তীর্থোদক পান করিতে পারেন।

নন্দ ও শ্রীদমন যে তীর্থে আসিয়া উপনীত হইল তাহা আকারে ছোট, মাহাত্ম্যেও ছোট। বহু জন অধ্যুষিত, বহু অর্ঘ্য সেবিত যে সকল সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে অহোরাত্র পূজাপার্বণাদি অনুষ্ঠিত হয়, ধনী দরিদ্র যেখানে যথানির্দিষ্ট সময়ে আপন আপন পূজা নিবেদন করিতে আসে, ইহা সেরূপ কোন তীর্থক্ষেত্র নহে। স্বর্ণমক্ষী নদী

গিরিসানুদেশে প্রবহমানা। তীরবর্তী পর্বতের উপর অবস্থিত এই কালীমন্দির দারুনির্মিত। কাঠের উপর কিছু কিছু কারুকার্য খোদিত থাকিলেও ভক্তবাঞ্ছাবিধায়িনী মহাকালীর এই একচূড় মন্দির জীর্ণদশাপ্রাপ্ত। মন্দির হইতে কুণ্ড অবধি যে সিঁড়ি নামিয়াছে, তাহাও কাষ্ঠনির্মিত এবং স্থানে স্থানে ভগ্নদশাগ্রস্ত। অবশ্য স্নানার্থীর আরোহণ-অবরোহণে ইহার জন্য কোনপ্রকার বিঘ্ন উপজাত হয় না। যুগপৎ স্নান ও পূজা, আহার ও বিশ্রামের এইরূপ সুবর্ণ সুযোগ লাভে বন্ধুদ্বয় পরম সন্তোষ প্রকাশ করিল। অসময়ে গ্রীষ্ম ঋতুর সমাগম হইয়াছে, দ্বিপ্রহরে নিদাঘের প্রাবল্য অনুভূত হয়। মন্দিরের এক পার্শ্বে আম, সেগুন, কদম্ব, তাল ও চম্পক তরুশ্রেণী-শোভিত একটি ছায়াশীতল উপবন। আহারাদি অন্তে এই স্থান বিশ্রামের উপযোগী। বন্ধুদ্বয় সর্বাগ্রে ধর্মানুষ্ঠান সারিয়া লইল। মন্দিরে কোন পুরোহিত না থাকায় মুদ্রাবিনিময়ে ঘৃত তৈল ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা মন্দিরচত্বরে স্থাপিত শিবলিঙ্গগুলিকে অভিষিক্ত করা গেল না। দারুময় একটি পাত্রে কুণ্ডের জল আনয়নপূর্বক বিগ্রহের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিল, যথোচিত মন্ত্রোচ্চারণ করিল। অতঃপর তাহারা কুণ্ডের জলে অগ্রে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া আচমন করিল এবং তৎপরে অবগাহন করিতে লাগিল। কুণ্ডের শীতল জলে তাহাদেব পথশ্রান্তি দূর হইয়া গেল। স্নানতর্পণাদির জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন, তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও তাহারা মনের আনন্দে জলক্রীড়া করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের শরীর ও মন তৃপ্ত হইল এবং তাহারা পূর্বনির্বাচিত সেই ছায়াতরুতলে সমাগত হইল।

আহার্যদ্রব্য যাহা কিছু তাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল তাহা একই প্রকার। নিজ-নিজ আহার নিজেরাই যদি ভক্ষণ করিত তাহা হইলে কোন তারতম্য ঘটিত না। কিন্তু ভাই যেরূপ ভাইয়ের সহিত আপন আহার ভাগ করিয়া লয়, ইহারাও সেইরূপ করিল।

একখণ্ড পিষ্টক দুইভাগ করিয়া নন্দ শ্রীদমনের নিকট ধরিয়া দিয়া বলিল, 'বন্ধু, একখণ্ড লও।' শ্রীদমনও একটি ফলের অর্ধখণ্ড বন্ধুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'বন্ধু একখণ্ড লও।' দুই বন্ধুর আহারে বসিবার ধরন দুই প্রকারের। হরিৎ তৃণের উপর বাম হস্তের ভর দিয়া জানু ও পদদ্বয় একত্র করিয়া শ্রীদমন সম্মুখে আহার্য লইয়া বসিল। নন্দের বসিবার ধরন গ্রাম্যজনোচিত, সম্মুখ দিকে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া জানু তুলিয়া সে উবু হইয়া বসিয়াছে। ভদ্রভাবে উপবেশন করা তাহার অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই যে তাহাদের বিশেষ বিশেষ ধরনে আহারে বসা, বলা বাহুল্য ইহা তাহাদের আবাল্য অভ্যাসজনিত। এই বিষয়ে যদি ইহাদের কথঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে শ্রীদমন সম্ভবতঃ নন্দের ন্যায় হাঁটু তুলিয়া বসিতে চাহিত এবং নন্দও চাহিত শ্রীদমনের ন্যায় সভ্য ভব্য হইয়া উপবেশন করিতে। উহাদের পরিধেয়ের মধ্যেও অনেক প্রভেদ। সদ্যস্নাত নন্দের চিক্কণ কৃষ্ণ কেশের উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কাপড়ের টুপি, কণ্ঠে প্রবালমণ্ডিত স্বর্ণহার, বাহুতে একাধিক অনন্ত। শুভ্র কার্পাসের তৈয়ারি কৌপীন মাত্র তাহার অধোবাস। কণ্ঠালম্বিত স্বর্ণহারের অন্তরালে তাহার রোমশ ও পেশল বক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শ্রীদমন বস্ত্রখণ্ড দিয়া শিরোবেষ্টন করিয়াছে। পায়জামার ন্যায় তাহার অধোবাসের উপর ছোট-হাতা একটি আজানুলম্বিত আলখাল্লা। খোলা গলার ফাঁক দিয়া দেখা যায় একটি সূক্ষ্ম হারের সহিত তাহার গলায় একটি মাদুলি বাঁধা। উভয়েরই ললাটে শুভ্র গঙ্গামৃত্তিকার তিলক তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আহার শেষ হইল। ভুক্তাবশিষ্ট ফেলিয়া দিয়া দুই বন্ধু বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইল। বিশ্রম্ভালাপের পক্ষে এই কুঞ্জবন যে-কোন প্রাসাদ অপেক্ষা মনোরম। নিচে বেণু ও বেতসবনের ফাঁক দিয়া স্বর্ণমক্ষী কুণ্ড ও শেষের কয়েক ধাপ সিঁড়ি এবং ঘাট দেখা যাইতেছে। কুণ্ডের জল অবধি আনমিত কয়েকটি শাখায় জলজ

লতা মাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অদৃশ্য পক্ষিকুলের কল-কাকলির সহিত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রাম্যমাণ মধুপগুঞ্জনে বনস্থলী মুখর। আকাশ বাতাস পুষ্পের সৌরভে আমোদিত, যূথিকার সুগন্ধে নেশা ধরে। পাকা তালের অদ্ভুত একটি গন্ধ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। স্নানের পর নন্দ সর্ষপ তৈলে তাহার শরীর মার্জনা করিয়াছে তদুপরি চন্দনের প্রলেপ দিয়াছে। ফুলের সৌরভের সহিত এই তৈল্যচন্দনের গন্ধও কেমন অদ্ভুত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে মনে হয়। শ্রীদমন বলিল, 'ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, জরা ও মৃত্যু, ক্লেশ ও অন্ধত্ব এবং যে ষড়বিধ দুরদৃষ্টের প্রবাহ—তাহা হইতে আমরা এই স্থানে যেন কতই দূরে নিরাপদে রহিয়াছি। কি অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ—মনে হয় যেন অস্তিত্বের ঘূর্ণমান চক্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অশান্ত-ভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে, দৈবযোগে আমরা এই চক্রের একেবারে অচঞ্চল কেন্দ্রে স্থির হইয়া বসিয়া আছি এবং সহজভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। শোনো বন্ধু, চারিদিক কিরূপ শান্ত নিস্তব্ধ। তোমাকে শুনিতে বলিতেছি, কারণ স্তব্ধতা উপলব্ধি করিতে গেলে কান পাতিয়া থাকা দরকার। নিস্তব্ধতার নেপথ্যে যে-সকল ধ্বনির অনুরণন রহিয়াছে তাহার অনুধাবন করিলে মনে হয় মহানৈঃশব্দ্য যেন স্বপ্নে অস্ফুটস্বরে কি কথা কহিতেছে এবং আমরাও তাহা যেন স্বপ্নের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে শুনিতেছি।'

নন্দ বলিল, 'বন্ধু, তুমি যাহা বলিলে তাহা বাস্তবিকই সত্য। হট্টগোলের মধ্যে কান পাতিয়া কেহ শোনে না। স্তব্ধতার মধ্যে যে দু-একটি শব্দ প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই লোকে কান পাতিয়া শুনিতে চাহে। যাহা একেবারে নিঃশব্দ, তুষ্ণীভূত—তাহা তো নির্বাণের অবস্থা। সে অবস্থাকে শান্ত নিস্তব্ধ বলিলে কিছু কম বলা হয়।'

শ্রীদমন হাস্য সংবরণ করতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না। নির্বাণ নামক বস্তুকে ঠিক শান্ত সমাহিত বলিয়া কেহ অভিহিত করিবে বলিয়া মনে হয় না। তুমি কিন্তু নির্বাণ কি নহে বলিতে গিয়া

নির্বাণ যে কি পদার্থ বলিয়া দিলে। আপাতদৃষ্টিতে উহা পরস্পার বিরোধী প্রতীয়মান হইলেও, নির্বাণের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণনা সম্ভবপর নহে। তুমি অনেক সময় অজ্ঞাতসারে এমন সব প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়া ফেল যাহাকে অসম্ভব সত্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ কথা শুনিলে ক্রন্দন উদ্রেকের পূর্বে যেমন হয়, সেইরূপ আমার বক্ষঃপট যুগপৎ স্ফীত ও সংকুচিত হইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় হাসি ও কান্নার মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ নিকট। আনন্দ ও ক্লেশ, প্রীতি ও জুগুপ্সা ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্তই নিরর্থক মোহবিশেষ। সত্য বলিতে কি, ইহাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়ই বর্তমান। কিন্তু আমাদের অভিভূত করে এমন সকল মঙ্গলভাবের সহিত হাসিকান্নায় বিমিশ্রিত একটি ভাবকে অনায়াসেই স্বীকার করিয়া লওয়া চলে। আমাদের ভাষায় এই ভাব-বোধক একটি কথা আছে— বেদনা। একদিকে ইহা সহানুভূতি, অন্যদিকে ইহা প্রায় ক্রন্দনের ন্যায় আমাদের বক্ষে স্পন্দন জাগায়। তুমি যখন বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা বল, আমার মনে তখন এইপ্রকার ভাবের উদ্রেক হয়।'

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন তুমি এরূপ বেদনা পাও?' শ্রীদমন উত্তরে বলিল, 'কেন, বলিব? তাহার কারণ এই যে তুমি সংসারী মানুষ, ইহজগৎ লইয়াই তোমার কাজ কারবার। সুখদুঃখের উত্তাল সমুদ্রের ঊর্ধ্বে যাহারা অবিচলভাবে অবস্থান করিতে চাহেন, যাহারা সরোবরের পঙ্ক-মিশ্রিত জলের ঊর্ধ্বে প্রস্ফুটিত কমল-সদৃশ আপনার চিত্ত মেলিয়া ধরিতে চাহেন তুমি তো তাঁহাদের পর্যায়ে পড় না। তুমি তো এই সংসারকুণ্ডের অধস্তন প্রদেশে যেখানে শতসহস্র নাম ও রূপের বিভ্রান্তিকর বাহুল্য— সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পার। এই সংসারের সহিত তোমার এমন সাযুজ্য রহিয়াছে বলিয়া তোমাকে দেখিলেও আনন্দ হয়। এইরূপ যে তুমি, সেই তুমি যখন নির্বাণ ও নাস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বড় বড় কথা কহিতে থাক, বল

ইহা শান্তও নহে নিস্তব্ধও নহে, তখন হাস্য সংবরণ করিতে গিয়া কান্না আসিয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতেছিলাম ইহা বেদনাদায়ক। তোমার ন্যায় অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ লইয়াও কেহ যদি নির্বাণের কথা বলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহা হাস্য-বেদনার কারণ হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?'

নন্দ বাধা দিয়া বলিল, 'কিন্তু শোনো, তোমার কথা আমার ঠিক বোধগম্য হইল না। আমি সংসার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছি, আমার পদ্ম হওয়া ঘটিয়া উঠিল না বলিয়া যদি তোমার দুঃখ হয়— তাহা হইলে আমি কি আর বলিব। কিন্তু আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আমি যদি নির্বাণের বিষয়ে বলিয়া থাকি, তাহাতে দুঃখ পাইবার কি আছে। ইহা আমার ভাল লাগে নাই, আমিও তোমার কথায় দুঃখ পাইয়াছি জানিয়া রাখো।'

শ্রীদমন জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, কেন?'

উত্তরে নন্দ বলিল, 'তোমরা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, সত্যাসত্য-বিনিশ্চয় করিতে শিখিয়াছ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সংসারের মায়ায় তোমরা যেরূপ সহজে আবদ্ধ হও অ-পণ্ডিতেরাও সেইরূপ হয় না। ইহাতে আমার বড়ই কৌতুক বোধ হয়; তোমাদের আচরণে আমার মনে আনন্দমিশ্রিত সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এইস্থান নির্জন নিস্তব্ধ বলিয়া তোমার অন্তরে বহুবিধ চিন্তার উদয় হইতেছে। তুমি ক্ষুৎপিপাসাদি ষট্‌প্রবাহ অতিক্রম করিয়া অস্তিত্বের ধ্রুব কেন্দ্রে বিরাজ করিবার কথা ভাবিতে পারিতেছ। কিন্তু এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কান পাতিয়া শুনিলে বুঝিতে পারিবে এই স্থানের শান্ত সমাহিত যে-ভাবের কথা বলিলে তাহা অলীক কল্পনা মাত্র। পরস্পরের মিলন কামনায় পক্ষিকুল কূজন করিতেছে। মধুমক্ষী ও কীটপতঙ্গাদি আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। তৃণাচ্ছাদিত এই কুঞ্জে এই মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর যে প্রচণ্ড সংগ্রাম ঘটিতেছে, তাহার ঝনঝনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। ওই দেখ, রসাল বৃক্ষের বক্ষোলগ্ন

স্বর্ণলতিকা যেন কত অনুরাগে তরুটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কিন্তু উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বৃক্ষের জীবনীরস শোষণ করিয়া পুষ্পেপল্লবে মুঞ্জরিত হইয়া উঠা। জীবনতত্ত্বের সার সত্য এইখানে।'

শ্রীদমন বলিল 'বন্ধু তুমি যাহা বলিতে চাহ, তাহা আমি যে জানি না, এমন নহে। যদি তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত। আমি অবগত আছি যে সত্যজ্ঞান কেবল যে বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা নহে। মানবহৃদয়ের যে অন্তর্দৃষ্টি, তাহা সকল প্রকার ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্লীন রূপটুকু দেখিতে পায় ও তাহাদের স্বাক্ষর পড়িতে পারে। কার্য ও কারণের মধ্যে যে সহজ ও প্রাথমিক সম্পর্ক কেবল তাহা নহে, তাহাদের অন্তরস্থিত নিগূঢ় আত্মিক সম্বন্ধও এইরূপ অন্তর্জ্ঞানের নিকট প্রতিভাত হয়। যাহাকে আমরা শান্তি বা আনন্দ বলি, তাহা মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই মায়ারূপের অবলম্বন না থাকিলে কিরূপেই বা আমরা শান্তি অনুভব করিতাম কিরূপেই বা দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্তির আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। বাস্তবের সাহায্যে মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। কাব্য হইল তাহার এই অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান।'

নন্দ হাসিয়া বলিল 'অহো, ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে কাব্য হইল একধরনের জড়বুদ্ধির প্রকাশ, যাহা বিজ্ঞজনেরা তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞজনের অজ্ঞতা লইয়া উপহাসচ্ছলে বলা যায় যে তাহার মূর্খতার মোহ ঘোচে নাই, অথবা সে পুনরায় মূর্খের ন্যায় আচরণ করিতেছে। সত্য বলিতে কি, তোমাদের ন্যায় চতুর ব্যক্তিদের হাতে পড়িয়া আমাদের ন্যায় নির্বোধের দুর্গতির সীমা নাই। আমরা ভাবি বিজ্ঞ হইতে পারিলে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞ হইবার মুখে আবিষ্কার করা যায় মূর্খ হইয়া থাকা বহুগুণে শ্রেয়। সত্য উপলব্ধির নূতনতর, উচ্চতর সোপানের প্রতি নাই বা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, যখন তোমরা নিশ্চিত

জানিয়াছ যে প্রথম কয়েক ধাপ অতিক্রম করিতে পারি এমন আমাদের সাহস নাই।'

শ্রীদমন বলিল, 'কই বন্ধু, আমি তো কাহাকেও বলিতে যাই নাই যে বিজ্ঞ হইতেই হইবে। এস, আমাদের আহার তো সম্পন্ন হইল, এইবার আমরা কোমল তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া তরুশাখার অন্তরাল হইতে নীল আকাশ নিরীক্ষণ করি। যাহা আমরা দেখিতে ভালবাসি তাহা যখন অনায়াসদৃষ্ট হয়, তখন তাহা বড় আনন্দের। আমরা ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছি বলিয়া কষ্টাবলোকন না করিয়াও আকাশ দেখিতে পাইতেছি—ধরিত্রী এইরূপে আকাশ নিরীক্ষণ করেন।'

'শিয়, তথাস্তু' নন্দ বলিল।

শ্রীদমন তাহার ভাষা ব্যবহারের ভুল সংশোধন করিয়া বলিল 'শিয়াৎ'।

নন্দ হাসিয়া বলিল, 'শিয়াৎ! শিয়াৎ! যথেষ্ট হইয়াছে বাক্‌পটু মহাশয়, আমার ভাষা লইয়া আপনাকে চুলচেরা বিচার করিতে হইবে না। আমার মুখে দেবভাষার উচ্চারণ নাসারজ্জুবদ্ধ বলীবর্দের গর্জনের ন্যায় শুনাইবে—ইহাতে আর বিচিত্র কি!'

নন্দের এই কৌতুকাবহ উপমা শুনিয়া শ্রীদমন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অতঃপর তাহারা পূর্বপ্রস্তাবমত শয়ন করিল ও পুষ্পিত শাখার আন্দোলনের অন্তরালে সুনীল বিষ্ণুলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহাদের উভয়ের হস্তে শাখাপত্রের বীজন, ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিলে ইন্দ্রগোপ নামক কীটের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ধরিত্রী যেরূপ নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, নন্দের সেরূপ চাহিয়া থাকিতে কোন আগ্রহ ছিল না, নিতান্তই বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্য শুইয়াছিল। অচিরে সে গাত্রোত্থান করিল ও দ্রবিড়-জনসুলভ ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বজানু হইয়া পা ছড়াইয়া বসিল এবং একটি পুষ্পবৃন্ত দাঁতে কাটিতে লাগিল।

ইন্দ্রগোপ কীটের দিকে লক্ষ্য করিয়া নন্দ বলিল, 'এই কীট উৎপাত

বিশেষ, সম্ভবতঃ আমার এই সর্ষপতৈলমর্দিত শরীর ইহাদের আক্রমণের লক্ষ্য। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমাদের সুপরিজ্ঞাত কোন কারণবশতঃ ঐরাবতবাহন বজ্রায়ুধ দেবরাজ আমাদের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তদীয় নামাঙ্কিত এই যন্ত্রণা প্রেরণ করিয়াছেন।'

শ্রীদমন বলিল, 'তোমার প্রতি দেবরাজের অসন্তোষ হইবার তো কোন সংগত কারণ নাই। বিগত শরৎকালে গ্রামের সকল অধিবাসী আমরা যখন গ্রামসমিতিতে সমবেত হইয়া কি পদ্ধতিতে আমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে স্থির করি, তখন তুমিই তো একমাত্র বলিয়াছিলে যে সদাচারসম্মত ব্রাহ্মণ্যপ্রথা অনুসারে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। সমিতির গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য স্থির করিল যে আদিম পদ্ধতিতে যজ্ঞানুষ্ঠান সমীচীন হইবে। তাহারা বলিল যে ব্রাহ্মণ্যমন্ত্রের অনুস্বার বিসর্গাদি অপেক্ষা তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইন্দ্রের পূজা করা অধিকতর শ্রেয়। এই আদিম পদ্ধতি তাহাদের নিজস্ব সংস্কারের অনুকূল তো বটেই, অধিকন্তু অসুরদলন দৈত্যসূদন ইন্দ্রের এইরূপ পূজাই সংগত। অধিকাংশের মত অনুসারে যাহা ঘটিল, তাহার জন্য তুমি দায়ী হইতে যাইবে কেন?'

নন্দ বলিল, 'বন্ধু, তুমি যাহা বলিলে, অবিকল সেইরূপই ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু এখনও আমার ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে যদ্দণ্ডে আমি ব্রাহ্মণ্যরীতিতে ইন্দ্রপূজার সপক্ষে বলিতেছিলাম সেই মুহূর্তে আমার মনে হইতেছিল দেবরাজ কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কথা স্মরণে রাখিবেন? ধেনুকল্যাণ গ্রামে যদি তাঁহার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অন্য পাঁচজনের সহিত আমিও কি তাঁহার বিরাগভাজন হইব না? পরিশেষে গ্রামবাসীদের কি বলিয়া যে মনে হইল জানিনা—তাহারা ভাবিল যে আমরা গোপালক কৃষিজীবী সম্প্রদায়, আমাদের এত সমারোহে প্রয়োজন কি? মহেন্দ্রকে লইয়া আমাদের কি হইবে? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ একই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক তাঁহার পূজা করুন। আমাদের আরাধ্য হইল দুগ্ধবতী ধেনু, হিমবন্ত পর্বত ও শস্যশ্যামল ভূমি—ইহারাই হইল আমাদের সত্যকার দেবদেবী।

দেবাদিদেবের আবির্ভাবের অগ্রদূতরূপে ইন্দ্র যৎকালে এই ভূখণ্ডের আদিবাসী অনার্য দস্যুদের পরাস্ত না করেন, তখন ইঁহারাই তো আমাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। এখন সেই সকল পূজাপদ্ধতি যথার্থভাবে আমাদের স্মরণে নাই; কিন্তু অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি দ্বারা যদি আমরা চালিত হই, তাহা হইলে পুনরায়ত্ত করিতে বেগ পাইতে হইবে না। বলিতে পার স্মৃতি মন্থন করিয়া যে সকল পূজাপার্বণাদি অনুষ্ঠান করিব তাহা অর্বাচীন হইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের এই জনপদে আমরা সেই দীপ্তিমান্ হিমবান্ গিরিরাজের পূজা করিব যাহা হইতে নদীসকল নিষ্ক্রান্ত হয়, যদ্দ্বারা ভূমি সুফলা হয় এবং যাঁহার কল্যাণে গাভীসকল পয়স্বিনী হইয়া থাকে। এই নগাধি-রাজের তৃপ্তি হেতু আমরা আমাদের সর্বসুলক্ষণযুক্ত বৃষভসকল উৎসর্গ করিব; পুষ্পে ফলে দধি ও চিপিটক সহযোগে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব। অতঃপর আমাদের ধেনুসকল শারদীয় পুষ্পের মাল্য ধারণ পূর্বক পর্বতসানুদেশ প্রদক্ষিণ করিবে এবং বৃষভগণ হম্বা হম্বা রবে চারিদিক এমন মুখরিত করিয়া তুলিবে যে মনে হইবে জলভার-মন্থর মেঘগুলি বজ্রগম্ভীর নিনাদে হুংকার করিতেছে। সেই হইবে আমাদের গিরিপূজা—নূতন হউক কিম্বা পুরাতন হউক, এইরূপই হইল আমাদের পূজার পদ্ধতি। কেবল ব্রাহ্মণেরা যাহাতে এইরূপ পূজা অসিদ্ধ বলিয়া বিধান না দেন, আমরা সকল গৃহস্থের নিকট হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া প্রচুর দধি ও পায়সান্নে শতাধিক ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজন করাইব।······সেদিন গ্রাম-সমিতিতে কেহ কেহ এইরূপ বলিল, কেহ কেহ তাহাদের বক্তব্যে সম্মতি দিল, কেহ কেহ আপত্তি করিল। সূচনা হইতেই আমি গিরিপূজার বিরোধী, তাহার কারণ এই যে কৃষ্ণকায় অনার্যদের যিনি পরাভূত করিয়াছেন সেই ইন্দ্রের প্রতি আমার যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিষয় আমরা সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাত নহি, সেই সকল পূজা পদ্ধতি পুনরুদ্ধারে আমার স্পৃহা নাই। কিন্তু বন্ধু, তুমি তো সেদিন

ইন্দ্রপূজার বিপক্ষে ও নূতনভাবে পুরাতন গিরিপূজার প্রবর্তনের স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলে, তোমার জন্যই তো আমি চুপ করিয়া গেলাম। আমি সরল বিশ্বাসে ভাবিলাম যাহারা গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহারাই যদি ইন্দ্রপূজার বিরোধী হয় এবং পূজাপার্বণাদি সরলীকরণের পক্ষে মত দেয়, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তি কি আর বলিবে। আমাদের কেবল এতটুকুই আশা যে দৈত্যনিসূদন দেবরাজ আমাদের অপরাধ লইবেন না, আমরা যে ব্রাহ্মণভোজনের এরূপ বিরাট আয়োজন করিতেছি ইহাতে তিনি তৃপ্ত থাকিবেন এবং আমাদের প্রতি অবিচার করিয়া অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টির দ্বারা পীড়ন করিবেন না। এক-একবার আমার মনে হইতেছিল ক্রমাগত যজ্ঞের পূজা ও ভোগ গ্রহণ করিবার ফলে স্বয়ং ইন্দ্রের হয়তো মন্দাগ্নি হইয়া থাকিবে, হয়তো গিরিপূজা ও মাল্য-সুশোভিত ধেনুসকলের শোভাযাত্রা তাঁহার ভালই লাগিবে। আমরা সরল বিশ্বাসী মানুষ। ইন্দ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কিছু কম ছিল না। তবে মনে হয় অধুনা দেবরাজ স্বয়ং নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকিবেন।...এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া পরিশেষে পুরাতন পূজাপদ্ধতির পুনঃপ্রচলন আমার তো ভালই লাগিল, আরও ভাল লাগিল পর্বত সানুদেশে মাল্য-সুশোভিত ধেনুসকলের শোভাযাত্রা-সহ গোচারণ করিতে। এতৎসত্ত্বেও তুমি যখন আমার মুখের প্রাকৃত উচ্চারণ সংশোধন করিয়া বলিলে 'শিয়াৎ' আমার অদ্ভুত লাগিল। মনে হইল জটিল শব্দপ্রয়োগ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের দ্বারা তুমি সহজ সরলীকরণের উপায় বাহির করিলে।'

শ্রীদমন বলিল, 'মিথ্যা কেন আমাকে অনুযোগ দাও বন্ধু ? তুমিও তো ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজা ধরিতে গিয়া কি প্রকার গ্রাম্য বুলি আওড়াইলে। হয়তো ইহাতে তুমি প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া থাকিবে। কিন্তু জানিয়া রাখ, শুদ্ধ ও সংস্কৃত ভাষায় সহজকে প্রতিষ্ঠা করায় অনেক বেশি আনন্দ।'

॥ তিন ॥

কিয়ৎক্ষণ তুই বন্ধুই নিস্তব্ধ। শ্রীদমন পূর্বের ন্যায় আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ান। পেশল বাহুদ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন-পূর্বক নন্দ উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি তরুশ্রেণী অতিক্রম করিয়া কালীকুণ্ডের ঘাটের উপর নিবদ্ধ।

স্থূল ওষ্ঠের উপর তর্জনী নিবদ্ধ করিয়া নন্দ অকস্মাৎ নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিল, 'চুপ চুপ! অহো, আশ্চর্য! ভাই শ্রীদমন, গাত্রোত্থান করিয়া সন্তর্পণে একবার নিরীক্ষণ কর। দেখিতেছ না, স্নান করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে নামিতেছে। আহা, চক্ষু ভরিয়া দেখিবার মত। বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া লও, দেখিবার সামগ্রী এইরূপ দৈবাৎ দৃষ্টি-গোচর হয়। সে আমাদের দেখিতে পাইতেছে না, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতেছি।'

জনহীন দেবস্থানে তীর্থস্নানের জন্য একটি যুবতী সমাগত। সোপানের উপর বেশবাস খুলিয়া রাখিয়া তাহার নগ্নদেহের সমস্ত সৌন্দর্য লইয়া তরুণীটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেবল তাহার গলায় পুঁতির মালা ও কানের কুণ্ডল রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে। কেশদাম শাসনে রাখিবার জন্য একটি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা। চক্ষু ঝলসিত করিবার মত অঙ্গসৌষ্ঠব, দেখিয়া মনে হয় কোনো কুহকী মায়া ওই দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। লাবণ্যসংযুক্ত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর সূর্যের সোনার আলো ঝলমল করিতেছে। সৃজনকর্তা ব্রহ্মার স্বপ্নসম্ভূত সুঠাম দেহ— স্কন্ধদ্বয়ে কেমন একটা কোমল অসহায় ভাব, ক্ষীণ কটিতট অথচ নিতম্ব সুগঠিত, স্ফুটনোম্মুখ যৌবনকোরকের ন্যায় দৃঢ়, উন্নত কুচযুগ। ওই, বাহুলতা উত্তোলন করিয়া আপনার গ্রীবা ধারণ পূর্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, রোমরাজি-শোভিত কক্ষদেশ

দেখা যাইতেছে। মুনিগণের ধ্যান ভাঙিবার মত দৃঢ়পিনদ্ধ বক্ষদ্বয় চকিতে দৃষ্টিগোচর হইল। সর্বাপেক্ষা নয়নলোভন হইল ওই কটিতটের সৌষ্ঠব— ওই যেখানে সুকুমার পৃষ্ঠদেশ নিতম্বের সহিত মিলিয়াছে। কোমলের সহিত পেশলের এমন সুন্দর সমাবেশ ক্বচিৎ দেখা যায়। স্বর্গকামনায় তপোরত কণ্ডুমুনির তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রম্লোচানাম্নী যে অপ্সরাকে মর্ত্যে প্রেরণ করেন, এই দিব্যদেহা তন্বী যেন তাহারই প্রতীক।

শ্রীদমন উঠিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ তরুণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'চল, আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করি। সে আমাদের দেখিতে পাইতেছে না অথচ আমরা তাহাকে দেখিব, ইহা অন্যায়।'

রুদ্ধকণ্ঠে নন্দ বলিল, 'অন্যায় কিরূপে? এই স্থান নির্জন ও শান্তিপূর্ণ-বিধায় আমরাই তো আগে এইখানে আসি। আর যদি কেহ আমাদের পরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের বিচার্য নহে। না, এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া পাদমেকং ন গচ্ছামি। তাহা ছাড়া এখন যদি আমরা এই বনতল আমাদের পদশব্দে মুখর করিয়া চলিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ওই কন্যার লজ্জার অবধি থাকিবে না, সে বুঝিবে তাহার অগোচরে তাহাকে আমরা দেখিয়াছি। আমার তো ভালই লাগিতেছে। কেন, তোমার লাগিতেছে না? তোমার চক্ষুর্দ্বয় দেখিতেছি আরক্তিম হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ পাঠকালে তোমার এরূপ হয়, ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি।'

শ্রীদমন নন্দকে তিরস্কার পূর্বক বলিল, 'চুপ, তুমি বড় লঘুভাবে কথা কহিতেছ। দেখিতেছ না কি এই দৃশ্যের মধ্যে একটি শান্ত গম্ভীর ভাব রহিয়াছে। হৃদয় সংযত করিয়া পবিত্রভাবে যদি ইহা দেখিতে পার, তবেই এই দেখা সার্থক।'

নন্দ হাসিয়া বলিল, 'বন্ধু, তুমি যথার্থই বলিয়াছ এই দৃশ্য হাস্য-পরিহাসের বিষয় নহে। তুমি যাহাই বল-না কেন, আমার পক্ষে ইহা আনন্দের কারণ। তুমি তোমার ভূমিশয্যা হইতে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে

আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলে। কখনও কখনও এমন হয় যে সোজা দাঁড়াইয়া সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্গের সৌন্দর্য অত্যন্ত নিকটে প্রতিভাত হয়।'

অতঃপর তাহারা কিয়ৎক্ষণ সাড়াশব্দ না করিয়া দেখিতে লাগিল। সোনার বরণ কন্যাটি তাহাদেরই মত আচমন করিল ও যুক্তকরে প্রণাম করিল এবং অবশেষে স্নানের জন্য তীর্থে অবতরণ করিল। বন্ধুদ্বয় এতক্ষণ তাহাকে এক পার্শ্ব হইতে দেখিতেছিল, এইবার কেবল তাহার দেহাবয়ব নহে, মুখমণ্ডলও দৃষ্টিগোচর হইল। দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়ের অন্তর্বর্তী একটি সুডৌল বদনমণ্ডল— ক্ষুদ্র নাসিকা, সুমধুর ওষ্ঠাধর, অপ্রশস্ত ললাট, পদ্মপলাশ লোচন। ঈষৎ শিরশ্চালনার ফলে পরিপূর্ণ মুখাবয়ব স্পষ্টতর হইল। বন্ধুদ্বয় আচম্বিতে ভাবিল স্নানরত কন্যাটি তাহাদের আবার না দেখিয়া ফেলে! না, দেখিতে পায় নাই। বুঝিতে পারা গেল তনুশ্রী যেইরূপ মুখশ্রী তদপেক্ষা ন্যূন নহে, উভয়ের মধ্যে যেন সুসদৃশ একটি সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

নন্দ অঙ্গুলিমোটন করিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, 'আরে, ইহাকে তো আমি চিনি! এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে মুখ দেখিয়া চিনিলাম নিকটবর্তী মহিষডাল গ্রামের সুমন্ত্রের কন্যা, সীতা ইহার নাম। পূর্বেই ইহাকে চিনিতে পারা উচিত ছিল— এই তো সেদিন মাত্র ইহাকে সূর্যের দিকে উৎক্ষেপ করিয়াছি।'

নিম্নস্বরে কথা বলিলেও শ্রীদমনের উৎকণ্ঠা গোপন রহিল না, বলিল, 'উৎক্ষেপ করিয়াছিলে? সে কিরূপে হয়?'

নন্দ বলিল, 'হাঁ, হাঁ, উৎক্ষেপ করিয়াছিলাম বৈকি! আমার সবল বাহুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগে, সকল লোকের সম্মুখে ইহাকে সূর্যের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিধেয় বস্ত্রে ইহাকে আমি অগৌণে চিনিতাম। নগ্নাবস্থায় দেখা-মাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারে কয়জন? এক্ষণে আমার কোনো সন্দেহ নাই, নিশ্চিত বলিতে পারি ওই মেয়েটি মহিষডাল গ্রামের সীতা। গত বৎসর বসন্ত ঋতুতে আমি

পিতৃস্বসার আবাসস্থল মহিষডাল গ্রামে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় আদিত্যব্রত উপলক্ষ্যে যে উৎসবের আয়োজন হয়…।'

ব্যাকুলভাবে শ্রীদমন তাহার বন্ধুর বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিল, 'সে সব কথা পরে হইবে। আমাদের এই সান্নিধ্যের সুযোগ যেরূপ আছে তেমন দুর্যোগও রহিয়াছে। উহাকে আমরা অতি নিকট হইতে যেমন দেখিতেছি, তেমনি আমাদের কথা সহজেই তাহার শ্রুতিগম্য হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং আর একটি কথাও নহে।'

নন্দ পরিহাসের সুরে বলিল, 'অহো, বুঝিলাম। কথা কানে গেলে তরুণীটি ত্রস্ত পলায়ন করিবে, আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। তোমার নয়ন মন এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই মনে হইতেছে।'

রাগতভাবে শ্রীদমন তাহাকে নীরব রহিতে ইঙ্গিত করিল। আবার বন্ধুদ্বয় বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া বসিয়া সীতার তীর্থস্নানপর্ব দেখিতে লাগিল।

কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সে প্রথম উর্ধ্বমুখে নমস্কার করিল, অতঃপর সন্তর্পণে কুণ্ডের মধ্যে অবরোহণ করিয়া আচমন করিল। ধীরে ধীরে এক শীর্ষদেশ ব্যতীত সমস্ত দেহ কুণ্ডমধ্যে নিমজ্জন করিল। মস্তকের উপর তিনবার জলের ছিটা দিবার পর, অবগাহন সন্তরণ সহযোগে আপনার মনে জলকেলি করিতে লাগিল। অল্পকাল পরে সদ্যোস্নাত সিক্ত শীতল নগ্নদেহে সে ঘাটের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। অহো, কি সুন্দর শোভা! বন্ধুদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই যেন এখানেই এ অধ্যায়ের শেষ হইল না। তরুণী এইবার সোপানের উপর বসিল। এলায়িত কেশপাশ সুকুমার অঙ্গুলি সঞ্চালনে সূর্যালোকে বিস্তার করিয়া দিল। সে যে সকলের দৃষ্টির অগোচরে একান্তে রহিয়াছে— এই প্রত্যয়ের বশে তাহার লেশমাত্র সংকোচ নাই, জড়তা নাই। মনোরম দেহভঙ্গিমা সহকারে সে এদিকে

ওদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বসিল এবং বেশ কিছুকাল অতীত হইবার পর ধীরে ধীরে বেশবাস পরিধানপূর্বক মন্দিরের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নন্দ বলিল, 'ইহাকেই বলে ঘটনার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আমরা কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ করিতে পারিব, অঙ্গ সঞ্চালনও করিতে পারিব। পরিণামে দেখা যায় উপস্থিত থাকিয়াও অনুপস্থিতির অভিনয় করা রীতিমত ক্লান্তিকর।'

শ্রীদমন উত্তর করিল, 'তুমি যে কিরূপে এ কথা বলিতে পারিলে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। এইপ্রকার হৃদয়রঞ্জন অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলা এবং এই অস্তিত্বের মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেওয়া— ইহা অপেক্ষা আনন্দের কি আর কিছু আছে। সম্ভবপর হইলে আমি রুদ্ধনিশ্বাসে সর্বক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, তাহার বদনমণ্ডল যদ্যপি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যায় সেই আশঙ্কায় নহে। আমার একমাত্র ভয় ছিল সে যে একান্ত একাকিনী রহিয়াছে, পাছে তাহার সেই ধারণা মিথ্যা হয়। সত্য বলিতে কি, এই আশঙ্কায় আমার বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিতেছিল এবং মনে হইতেছিল তাহার এই বিশ্বাস ভাঙিলে আমি যেন পাতকী হইব। হ্যাঁ, উহার নাম কি যেন বলিতেছিলে? সীতা? নাম জানিয়া ভালই হইল, মনে মনে এই নামের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিব। আর যেন কি বলিতেছিলে? বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত করার দ্বারা উহাকে তুমি চিনিয়াছিলে?'

নন্দ বলিল, 'সে কথা তো ইতিপূর্বে তোমায় বলিয়াছি। গত বৎসর বসন্ত ঋতুতে আমি উহাদের গ্রামে যখন অবস্থান করিতেছিলাম, গ্রামের লোকে উহাকে সূর্যকুমারীরূপে নির্বাচন করে। মার্তণ্ডদেবের প্রসাদ লাভের জন্য আমার বাহুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এত উপরে উঠিয়াছিল যে উহার চীৎকার নিতান্ত ক্ষীণভাবে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল— অবশ্য এমনও

হইতে পারে যে জনগণের উল্লাসধ্বনির মধ্যে তাহার চীৎকার অবলুপ্ত হইয়া থাকিবে।'

শ্রীদমন বলিল, 'বন্ধু, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। এরূপ সৌভাগ্য কম লোকেরই ঘটে। অনুমান হয় তোমার বলিষ্ঠ পেশল বাহুদ্বয়ের জন্য এই উৎক্ষেপণ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলে। আমি যেন কল্পনায় নীল আকাশে উড্ডীন তাহার তন্বী দেহখানি দেখিতে পাইতেছি। সেই ছবির সঙ্গে তাহার আর একটি ছবি আমার মনশ্চক্ষে ভাসিতেছে : তীর্থের তীরে সীতা বন্দনার ভঙ্গীতে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।'

নন্দ কহিল, 'সে যাহাই হউক। দেখা যাইতেছে পূজা বন্দনা তপশ্চারণ ব্যতীত তাহার অন্য গতি নাই। সে যে পাপকর্মে লিপ্ত হইবে এমন বলি না, কিন্তু তাহার ওই সুন্দর মুখের জন্য তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। সে বেচারা অনন্যোপায় এ কথা সত্য, কিন্তু ইহাও তো অস্বীকার করার জো নাই সে নিজেই ইহার জন্য দায়ী। তাহার সুন্দর দেহ দেখিয়া কেন আমরা মুগ্ধ হই? কারণ উহা একপ্রকার বন্ধন, মোহগ্রস্ত হইয়া আমাদের যাবতীয় কামনা বাসনা এই বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়ে। এমন করিয়াই যে-ব্যক্তি দর্শকমাত্র ছিল সে সংসারের জালে বন্ধনদশাপ্রাপ্ত হয় এবং যেমন করিয়া শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দেহের মৃত্যু ঘটে তেমনি মোহবদ্ধ জীবের চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, রূপ এইরূপে মানুষের চিত্ত অধিকার করে। পদ্মপলাশলোচনা যখন অপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করে, তখন মনে হয় এই দৃষ্টির কোনো অর্থ আছে। তুমি হয়তো বলিবে বিধাতা তাহার এই তনুদেহখানি দিয়াছেন এবং বিধাতার বিধানে সীতার কোনো হাত নাই সুতরাং দোষও নাই। কিন্তু সত্য বলিতে কি, কোনো কোনো স্থলে 'দেওয়া' ও 'লওয়া' উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ। সীতা সম্ভবত ইহা জানে, সেইজন্য রূপের গর্ব অপেক্ষা রূপের লজ্জা তাহার অনেক বেশি। এই যে তাহার দেহসৌষ্ঠব, সে কি ইহা দানরূপে গ্রহণ করিয়াছে না তাহার

প্রাপ্য বলিয়া লইয়াছে। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে 'লওয়া' অর্থে 'পাওয়া'। যতই সে তীর্থস্নান করুক-না কেন, তাহার এই 'পাওয়া' হইতে উদ্ধার নাই— সে যতখানি রূপের সম্ভার লইয়া কুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল, কুণ্ড হইতে বাহির হইলে দেখা গেল সেই চিত্তহারী রূপ এক তিলও কমে নাই।'

শ্রীদমন আবেগকম্পিত কণ্ঠে নন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'এমন একটি পেলব পবিত্র রমণীর বিষয়ে তোমার এইপ্রকার বর্বরোচিত রূঢ় উক্তি ভৎ´সনার যোগ্য, দুঃসাহসের বশে তুমি বিজ্ঞ দার্শনিকের ন্যায় অনেক কথাই বলিলে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, তোমার ভাষা গ্রাম্যতাদুষ্ট এবং অধীত জ্ঞানের তুমি যেরূপ অপব্যবহার করিলে, তাহা হইতে প্রতীত হয় যে যে-স্বর্গীয় শোভা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম, তুমি উহা দর্শনের অযোগ্য। এই দেখার মূল কথাই হইল কিরূপ মন লইয়া দেখিলে।'

নন্দ শ্রীদমনের তিরস্কার নম্রভাবে স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, 'দাদাঠাকুর, আপনি কিরূপ মন লইয়া দেখিলেন এবং আমার কিরূপ দেখা উচিত ছিল তদ্‌বিষয়ে আপনি আমায় শিক্ষা দান করুন।'

শ্রীদমন বলিল, 'তাহা হইলে অবধান কর। প্রতি জীবের দুই স্বতন্ত্র সত্তা—একটির প্রকাশ তাহার অন্তরে, অপরটির প্রকাশ বাহিরে। সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানতা-হেতু সকল প্রাণীই সত্তাবিশেষ। এক্ষণে সত্তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে হইলে কেবল তাহার বাহিরের রূপটুকু দেখিলে চলিবে না, তাহার অন্তরের পরিচয় লাভ করিতে হইবে। কেবল রূপ যাহারা দেখিল, ভাব দেখিল না—তাহারা যে কেবল অসম্পূর্ণ ভাবে দেখিল তাহা নহে, পরন্তু অন্যায়ভাবে দেখিল। জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুককে দেখিয়া আমাদেব মনে যে জুগুপ্সার সঞ্চার হয় তাহা সর্বতোভাবে প্রশমন করা কর্তব্য। চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামের সাক্ষ্য চরম বলিয়া মনে করা ভুল— কারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি তাহা অনুভূতিসর্বস্ব।

তাহা বাস্তব হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্যের এক অতি তুচ্ছ ভগ্নাংশ মাত্র। এই বাস্তব অতিক্রম করিয়া যখন প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি বাহিরের রূপের অন্তরালে রহিয়াছে অন্তরের রস, যাহা নাকি প্রাণিগণের সত্যকার সত্তা। দুঃখ দুর্গতি দর্শনে যে ঘৃণার ভাব উদ্রেক হয় কেবল তাহা দমন করিলে যথেষ্ট হইল না। সুন্দর রূপ দেখিলে আমাদের চিত্তে যে কামভাবের উদ্রেক হয়; তাহাও সংযত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে ইহাও বাহিরের রূপ। কদর্য বস্তু দেখিয়া অবজ্ঞা ও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, মূলতঃ একই মোহ হইতে সঞ্জাত। বলিতে পার দারিদ্র্য দেখিলে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে করুণা জন্মে, বিবেকে আঘাত লাগে। কিন্তু সুন্দর যাহা তাহা এক মুহূর্তে চক্ষুকে জিনিয়া লয়, তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার কথা মনে উদয়মাত্র হয় না। কিন্তু জানিও কেবল উপভোগের বস্তুরূপে যদি রূপকে নিরীক্ষণ করি, তাহা হইলে রূপের প্রকৃত সত্তা আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে। ইহা ঘোরতর অন্যায়, কারণ ইহা দ্বারা রূপের সত্য অবহেলিত হয়। আমার মনে হয় রূপ যে আধারকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার অজ্ঞাতসারে যদি রূপের বহিরঙ্গ উপভোগ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে এতদপেক্ষা গর্হিত আর কিছুই হইতে পারে না। যে-রূপবতীকে আমরা দেখিলাম, তুমি যে সুমন্ত্রকন্যা সীতা বলিয়া তাহাকে আখ্যাত করিলে, ইহাতে আমার মনের ভার বহুল পরিমাণে লাঘব হইল। এতদ্দ্বারা রূপের সহিত নাম যুক্ত হইল এবং নাম হইল ব্যক্তির গভীরতম সত্তা এমন-কি তাহার আত্মার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তুমি যখন উপরন্তু বলিলে এই কন্যা সুশীলা, তখন আমার অধিকতর আনন্দ হইল, কারণ চারিত্র এমন একটি বস্তু যাহা রূপের অন্তরস্থিত ভাবের সহিত আশ্রিত। অবশ্য নারীসুলভ অভ্যাসবশে স্বভাবজ রূপকে সে প্রসাধনের দ্বারা সজ্জিত করিতে চাহিয়াছে তাহার নিদর্শন দেখিলাম। মনে হইল

কমললোচনার আঁখিপল্লবে, আঁখিপক্ষ্মে কজ্জলের স্পর্শ লাগিয়াছে। এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে অঙ্গসজ্জা ও প্রসাধন নারীদিগের পক্ষে লোকাচারসম্মত এবং ইহার সহিত নৈতিক চরিত্রের কোনও সম্পর্ক নাই। এই কন্যাটি সম্ভবত তাহার সরল হৃদয়ের সহজ প্রবণতাবশত সমাজ-সমর্থিত প্রসাধনের আশ্রয় লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহা সুন্দর, তাহা আপন রূপকে অবহেলিত করিবে এমন হওয়া অনুচিত। আপন রূপকে মর্যাদা দিতে গিয়া সীতা হয়তো আপন আত্মাকেই সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছে। আমার অনুমান করিতে ভাল লাগে যে সুমন্ত্র ও তস্য পত্নী এই কন্যাটিকে যত্ন-পূর্বক লালন করিয়াছে, আচারে নিষ্ঠায় ও গৃহধর্ম পালনে ইহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করিয়াছে। কল্পনায় যেন দেখিতেছি সীতা গৃহকর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, উদূখলে গম পিষিতেছে, অগ্নিতে চর্পটি সেঁক দিতেছে, চরকায় সুতা কাটিতেছে। ইচ্ছা হয় তাহার বাহ্যরূপ তাহার অগোচরে সন্দর্শন করার পাপ, তাহাকে নামরূপে ব্যক্তিরূপে দেখিয়া ক্ষালন করি।'

নন্দ বলিল, 'তোমার বক্তব্য আমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। কিন্তু স্মরণ রাখিও এইরূপ বলবতী আগ্রহ আমার না থাকিতেও পারে। যে মুহূর্তে তাহার বাহুমূল ধরিয়া তাহাকে সূর্যের দিকে প্রক্ষেপ করিয়াছি, তদ্দণ্ডেই তাহার ব্যক্তিস্বরূপ সমীপবর্তী হইয়া আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।'

ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে শ্রীদমন বলিল, 'এইরূপ ঘন সান্নিধ্য না হইলেই বোধ করি ভাল হইত। আসুরিক শক্তি ও পেশল বাহু তোমাকে এই সান্নিধ্যের অধিকার দিয়াছিল সন্দেহ নাই। তোমাকে যাহারা এই প্রক্ষেপ কার্যের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহারা তোমার মন-চিন্তনের প্রতি দৃষ্টি দেয় নাই। তুমিও বোধ করি এই সামীপ্য-হেতু সীতার বস্তুরূপই লক্ষ্য করিয়াছিলে। সবল বাহুর দ্বারা তাহার দেহকে সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে। তাহার চিত্ত,

তাহার অন্তরস্থিত আত্মার প্রকাশ, তোমার নিকট অগোচর রহিয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে সীতার অঙ্গসৌষ্ঠব বিষয়ে এরূপ অমার্জিত ও অমার্জনীয় ভাষা প্রয়োগ করিতে না। নারী মাত্রেই— সে বালিকা, কিশোরী, যুবতী, পালিতা কন্যা, বৃদ্ধা যাহাই হউক-না কেন— জীবধাত্রী জগজ্জননী আদ্যাশক্তির বিগ্রহমাত্র। ইহা হইতেই জীবসকলের জন্ম হয় এবং মৃত্যুর পরে সকলে ইঁহাতেই গমন করে। এইজন্য এই বিশ্বমাতৃত্বের যোনিচিহ্ন-ধারিণী সকল নারীই আমাদের পূজাবন্দনার পাত্রী। এই মহীয়সী দিব্যরূপ ধারণপূর্বক স্বর্ণমক্ষী নদীতীরে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। এই আবির্ভাব যদি আমাদের হৃদয় উদ্‌বেলিত করে, তাহা হইলে বিচিত্র কি! বস্তুতপক্ষে বুঝিতে পারিতেছি আমার কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে। অবশ্য তোমার অশোভন উক্তিতে কুপিত হওয়াও এইরূপ উত্তেজনার কারণ হইতে পারে···।'

নন্দ বলিল, 'একি বন্ধু, তোমার গণ্ড ও কপোলদেশ যে আরক্তিম দেখিতেছি। তোমার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার দেখিলাম। সত্য বলিতে কি, উক্ত মূর্তি সন্দর্শনে আমার মনেও যে ভাবাবেগ হয় নাই এরূপ নহে।'

'তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে যে-মূর্তি সন্দর্শনে চিত্ত বিভ্রান্ত হয় ও বিচারবুদ্ধি অন্তর্হিত হয়, তৎসম্বন্ধে তুমি এরূপ লঘু উক্তি করিতে না এবং এই সম্মোহনের উদ্ভব যাহা হইতে, সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিতে বিরত হইতে। তাহার যে ব্যক্তিস্বরূপ এইরূপ মনোমোহিনী রূপে উদ্‌ঘাটিত হইল তদ্‌বিষয়ে তোমার ধারণামাত্র নাই। তাহা না হইলে এইরূপ একদেশদর্শিতার অপরাধ করিতে না। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না এই প্রকাশের মধ্যে বহু এক হইয়া মিলিত হইয়াছে। এই নারীমূর্তিতে বিধৃত রহিয়াছে একাধারে জীবন ও মৃত্যু, সম্মোহ ও জ্ঞান। ইনি যেমন বন্ধন করেন সেইরূপ মুক্তি প্রদান করেন। তুমি ভাবিতেছ জগৎ-ব্যাপী সকল প্রাণীকে ইনি ছলনা করেন। ইনি যে সংশয়ের অন্ধকার হইতে আমাদের

সত্যের আলোকে উপনীত করেন, ইহাই তোমার বোধগম্য হইল না। অজ্ঞানতা-বশত একটি যে মহান ও নিগূঢ় রহস্য তোমার অনায়ত্ত রহিয়া গেল তাহা এই যে, যে-মোহমদিরার স্রোতোরাশি আমাদের অধোগামী করে, তাহাই আবার সত্য ও যুক্তির উচ্চতম শিখরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এইরূপে আমাদের বন্ধনই মুক্তির কারণ হইয়া উঠে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য উপলব্ধির আনন্দে পরিণত হয়।'

নন্দের অক্ষিযুগল অশ্রুতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় বড়ই ভাবপ্রবণ এবং তত্ত্বকথা শুনিবা-মাত্র তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠে। সচরাচর শ্রীদমনের কণ্ঠস্বর মৃদু ও কোমল, অদ্য আবেগ ও উত্তেজনা বশত তাহার স্বরে এমন একটি গভীরতা প্রকাশ পাইল, যাহা নন্দের পক্ষে একান্ত মর্মস্পর্শী মনে হইল। হ্রস্ব নাসা হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, 'বন্ধু, আজ তুমি যেরূপ গভীর সুরে গভীর কথা কহিলে, এমনটি তো ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। তোমার কথা এমনভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে যে এক-একবার মনে হইল তুমি থামিলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু থামিও না বন্ধু, বল তুমি কি বলিতেছিলে মানুষের আত্মা, মোহশৃঙ্খল এবং সর্বাশ্রয়স্বরূপিণী বিষয়ে···।

শ্রীদমন পূর্বের মত বিজ্ঞভাবে বলিতে লাগিল, 'তাহা হইলে ইহার তাৎপর্য বুঝিলে তো? দেবী যে কেবল আমাদের মোহাচ্ছন্ন করেন তাহা নহে, তিনি আমাদের জ্ঞানও দেন। আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা যদি তোমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে তাহার কারণ এই যে এই দেবীই হইলেন ব্রহ্মবাদিনী বাগ্‌দেবী। দুই বিভিন্ন রূপে তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকট করিয়া থাকেন। কালী করালীরূপে তিনি যেমন জীবের রক্ত পান করেন, তেমনই শ্বেতভূজা অন্নপূর্ণারূপে কল্যাণময়ী জীবধাত্রী প্রাণীসকলকে আপনার অঙ্কে স্থান দিয়া লালন পালন করেন। বিষ্ণুর মায়ারূপে তিনি বিষ্ণুকে বাহু দিয়া বেষ্টন করেন। সেখানে তিনি বিষ্ণুর স্বপ্নসম্ভূতা। অপর

পক্ষে বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের স্বপ্নসকল যেন এই দেবীর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। কত নদ কত নদী অনন্ত গঙ্গার বুকে প্রবাহিত হয়, কিন্তু গঙ্গার গন্তব্য হইল সেই এক মহাসাগর। এইরূপে জগৎকারণ বিষ্ণুর মধ্যে প্রবহমান আমাদের চিত্ত জগন্মাতার মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। দেখ অদৃষ্টের কি অপূর্ব মহিমা! ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা তীর্থস্নান করিলাম। আমাদের মনোবাঞ্ছা কুণ্ডের জলে প্রবাহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু যিনি একাধারে জগজ্জননী ও মহাকালী, যাঁহার ভ্রূণসমুদ্রে আমরা জলকেলি করিতেছিলাম, তিনি স্বয়ং মোহিনীমূর্তি ধারণ-পূর্বক আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উপজাত করিয়া অবির্ভূত হইলেন। ইহা তো কেবল আবির্ভাব নহে, যেন বর দান। দেবীর প্রতীকচিহ্নস্বরূপ যোনিপট্টে আমরা যে কৃতাঞ্জলি-পূর্বক অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম, এই বর লাভ করিলাম সেইজন্য। লিঙ্গ ও যোনি এতদুভয় অপেক্ষা মহত্তর প্রতীক-চিহ্ন আর কিছু হইতে পারে না। জীবনের মাহেন্দ্র ক্ষণ কখন আবির্ভূত হয়? যখন শক্তিস্বরূপিণী নারীর হস্তের সহিত পুরুষের হস্ত গন্ধমাল্য দ্বারা সংযুক্ত হয় এবং যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবার পর পুরুষ বলে—

অহং ইমাং প্রতিগৃহ্ণামি।

পিতামাতা কন্যাকে সম্প্রদান করিলে পর সে যখন রাজোচিত গৌরবের সহিত বলে:

সোঽহম্ তত্ত্বমসি
দিব্যোঽহম্ পৃথিব্যাস্ত্বমসি
অহং বাচো ত্বং সংগীতম্
সংগচ্ছস্ব সমানুব্রতে।

প্রথম যখন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে উপগমন করে তখন তাহারা সংকীর্ণ মানবিকতা অতিক্রান্ত হয়। তখন ব্যক্তিভেদ লিঙ্গভেদ থাকে না,

উভয়ে মিলিত হইয়া হরপার্বতীর সদৃশ হইয়া থাকে। তখন তাহারা যে-ভাষায় কথা বলে তাহা আর তাহাদের ভাষা থাকে না। সে-ভাষা সুরাসমুদ্র হইতে উদ্‌গত হইয়া যেন আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতার আনন্দে অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তির রূপ ধারণ করে। এই মিলনমুহূর্ত হইল সেই পরম লগ্ন যখন মাতৃজঠরের আত্মকেন্দ্রিক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা চৈতন্যের তীর্থে অবগাহন করি। প্রেমের পুলক এমনই বস্তু যে ইহার প্রভাবে দেহ ও মনের, জন্ম ও মৃত্যুর ভেদাভেদ বিলুপ্ত হইয়া থাকে।'

এই-সকল জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তত্ত্বের কথা নন্দ বিমূঢ় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে লাগিল। আনন্দে তাহার চক্ষু হইতে জল ঝরিতে লাগিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল: 'সত্যই বাগ্‌দেবী তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন। তোমার বাক্য শ্রবণ করিলে নিরতিশয় আনন্দ-জনিত বেদনা অনুভব করি। তত্রাচ মনে হয় যুগ যুগ ধরিয়া যেন তোমার কথা শুনি। তোমার মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার কিঞ্চিন্মাত্র যদি আমি আমার গানে কিংবা বচনে প্রকাশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইত, বুঝিতাম দেহ ও মনের সৌষ্ঠব একত্র-যুক্ত হইয়া সর্বাঙ্গসুন্দর হইল। এইজন্যই তো তোমাকে আমার এত প্রয়োজন। কনিষ্ঠের মধ্যে যাহা নাই, তুমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া তোমার মধ্যে তাহা আছে। আবার যেহেতু তুমি আমার সুহৃদ্‌, সেইজন্য তোমার যাহা আছে তাহা যেন আমারই বলিয়া মনে হয়। আমার মধ্যে তোমার অংশ কিছু আছে বলিয়া আমি কিয়ৎ পরিমাণে শ্রীদমন, অন্যথায় আমি কেবল নন্দই রহিতাম অর্থাৎ অপূর্ণ রহিতাম। সত্য বলিতে কি, তোমা হইতে বিচ্ছেদ আমার পক্ষে দুর্বিষহ মনে হইবে। আমার সেই ব্যর্থ জীবন আমি চিতাগ্নিতে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইব না। এখন এস, এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে কিঞ্চিৎ তাম্বুল চর্বণ করা যাক।'

অঙ্গুরীয় শোভিত তাহার শ্যামবর্ণ অঙ্গুলি সে পেটিকার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিল ও এক গুচ্ছ পানের পাতা বাহির করিয়া পান সাজিতে বসিল। আহারান্তে তাম্বুল সেবন উপাদেয়, ইহাতে মুখ সুগন্ধযুক্ত হয়। অশ্রুসিক্ত মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া, নন্দ বন্ধুর হস্তে একটি পান দিল। ইহা যেন তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্যের সাক্ষ্য ও প্রতীক।

॥ চার ॥

অতঃপর তাহারা পরস্পরের উদ্দেশ্য-সাধনার্থ বাহির হইয়া পড়িল। কার্যব্যপদেশে নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা করার ফলে পরস্পরের সঙ্গচ্যুত হইতে হইল। তরণী-সমাকীর্ণ যমুনা নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলে পর তাহারা দেখিল দিগন্তে ইন্দ্রপ্রস্থের হর্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে। বলদবাহিত বহু যান-সমাকীর্ণ সংকীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীদমন চলিল সেই বণিকের গৃহে যেখানে উদুখল ও চকমকি পাথর ক্রয় করা যাইবে। নন্দ পদচিহ্নের পথ ধরিয়া নগরের উপকণ্ঠে চলিল। সেখানকার কুটিরবাসী উপজাতীয়দের নিকট সে কর্মকার পিতার জন্য অপরিশোধিত লৌহপিণ্ড ক্রয় করিবে। পরস্পরের নিকট বিদায় লইবার কালে দুই বন্ধু প্রতিশ্রুত রহিল যে আপন আপন ব্যবসায়কর্ম সমাধা হইলে পর তাহারা তৃতীয় দিবসে উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে এবং যেরূপ একত্রে আসিয়াছিল সেইরূপ একত্র প্রত্যাবর্তন করিবে।

তিন দিবস অতিবাহিত হইলে পর নন্দ যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। লৌহপিণ্ড বহন করিবার জন্য উপজাতীয়েরা তাহাকে ধূসর বর্ণের একটি গর্দভ দিয়াছিল। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল, অথচ শ্রীদমনের সাক্ষাৎ নাই। অবশেষে দেখা গেল পৃষ্ঠদেশে উদুখল ও চকমকি পাথরের একটি পেটিকা বহন করিয়া শ্রীদমন মন্থর পদক্ষেপে আসিতেছে। তাহার পদদ্বয় যেন চলিতে চাহিতেছে না, গণ্ডদেশ শীর্ণ ও চক্ষুর তলদেশে গভীর ক্লান্তির কালিমা। বন্ধুকে দেখিয়া সে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইল না। নন্দ যখন দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শ্রীদমনের বোঝা নামাইয়া গর্দভের পৃষ্ঠে স্থাপন করিল, তখনও শ্রীদমন নির্বিকার। নন্দের সহিত যখন সে চলিতে

আরম্ভ করিল, তাহার বিষাদগ্রস্ত ভাবের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। বন্ধুর প্রশ্নজিজ্ঞাসায় সে অস্ফুটভাবে 'হুঁ' 'হাঁ' করিতে লাগিল; এমন কি যে-স্থলে 'না' বলিতে হইত সেখানেও 'হুঁ' 'হাঁ' ব্যতীত আর কোনো শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। যখন আহারাদি ও বিশ্রামের সময় আসিল, ঠিক সেই সময় সে 'হাঁ' বলিতে গিয়া 'না' বলিল। বলিল তাহার জঠরে ক্ষুধা নাই, নয়নে নিদ্রা নাই।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল শ্রীদমন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবস সায়াহ্নে তাহারা যখন তাবার আলোকে পথ চিনিয়া চলিতেছে, উৎকণ্ঠিত নন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে শ্রীদমন অর্ধস্ফুটকণ্ঠে যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে সে সত্যই অসুস্থ এবং মৃত্যু ব্যতিরেকে তাহার এই অসুখের আর কোনও চিকিৎসা নাই। সে বলিল তাহার এই ব্যাধি এমনই প্রকারের যে ইহার পরিণাম কেবল যে নিশ্চিত মৃত্যু তাহা নহে, এক্ষণে মৃত্যুই তাহার কাম্য। ভবিতব্যের সহিত ঈপ্সিতের এমন সংযোগ ঘটিয়াছে যে উভয়ের মধ্যে আর তারতম্য নাই—উভয়ে যেন উভয়কে অনিবার্য মৃত্যুর অভিমুখে নিয়ত অগ্রসর করিয়া দিতেছে। কাতর কণ্ঠে সে নন্দকে বলিল :

'তুমি যদি যথার্থই আমার মিত্ররূপে পরিচিত হইতে চাও, তাহা হইলে বন্ধুত্বের শেষকৃত্যরূপে চিতাগ্নি প্রস্তুত কর। আমি সেই হুতাশনে আপনাকে আহুতি দান করি। যে-ব্যাধির অগ্নিতে আমি নিয়ত দগ্ধ হইতেছি, তাহার নিকট চিতাগ্নিও শীতল তীর্থ-জলের ন্যায় প্রতীত হইবে।

শ্রীদমনের এইপ্রকার খেদোক্তি নন্দের কর্ণগোচর হইলে পর, নন্দ ভাবিতে লাগিল 'হা ভগবান। ইহার পরিণাম কোথায় কে জানে!' নন্দের অনুচ্চ নাসা, তাহার ভাব-ভঙ্গি আচার-আচরণ নীচ জাতির অনুরূপ না হইলেও ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীদমন হইতে তাহার অনৈক্য প্রচুর। তৎসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে উচ্চবর্ণ-

সম্ভূত তাহার সহচরের এইপ্রকার মানসিক বৈক্লব্যের মধ্যেও সে তাহার মাথা ঠিক রাখিয়াছিল। সূচনায় তাহার মনে যে-আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল তাহা সে দমন করিল। ব্যাধিগ্রস্তকে শুশ্রূষার ছলে সুস্থ ব্যক্তি যেমন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে, সেইভাবে নন্দ মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া যুক্তি প্রয়োগে বন্ধুকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল, 'তুমি বলিতেছ যে-রোগে তুমি আক্রান্ত হইয়াছ তাহার চিকিৎসা নাই। তুমি যখন বলিতেছ তখন সে কথা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। সত্যই যদি সেরূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার নির্দেশ অনুসারে চিতাগ্নি আমি অবশ্যই প্রস্তুত করিব। এই অন্ত্যেষ্টি-শয্যা এরূপ হইবে যে ইহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া আমিও যেন তোমার পার্শ্বে শয়ন করিতে পারি। কারণ, বন্ধু, তোমার বিচ্ছেদ এক দণ্ডও যখন আমার সহনাতীত, তখন তোমার সহিত সহমরণে প্রবেশ করা, আমার পক্ষে বহুগুণে শ্রেয়। আমার মনের এইরূপ অবস্থা বিধায় এবং যেহেতু ইহা আমার পক্ষে জন্ম-মরণ সমস্যা, আমার পক্ষে ইহা জানিতে চাওয়া স্বাভাবিক—কী এই ব্যাধি। ইহা চিকিৎসার অতীত ও দুরপনেয় জানিলে পর তোমার সহিত ভস্মান্ত হইতে আমার মনে আর কোনও দ্বিধা থাকিবে না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা যে অন্যায় নহে ইহা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে। স্বল্পবুদ্ধি সত্ত্বেও যদি এই প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুবুদ্ধি তুমি, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। যদি আমি তোমার স্থলাভিষিক্ত হইতাম, অর্থাৎ আমার ঘাড়ে তোমার মাথা চাপাইয়া চিন্তা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার অর্থে তোমার সর্বাগ্রে এই চিন্তাই খেলিত যে, চরম সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে একবার অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লই আমার এই ব্যাধি চিকিৎসার অতীত কি না। অতএব, বলো বন্ধু, কী তোমার ব্যাধি?'

শ্রীদমনের গণ্ডদেশ শীর্ণ। বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তর থাকিয়া

সে বলিল, তাহাকে দেখিলেই তো প্রতীত হইবে যে তাহার আরোগ্যের আশা নাই, ইহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন। অবশেষে নন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে, বন্ধুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হইতে আপনাকে অবসৃত রাখিবার উদ্দেশ্যেই যেন এক হাতে নিজের চক্ষু ঢাকিয়া, শ্রীদমন বলিতে লাগিল :

'সুমন্ত্রকন্যা সীতা, সেই যাহাকে সূর্যব্রত উদ্‌যাপনের সময় তুমি আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে, তাহার পাপলেশহীন বিশুদ্ধ নগ্নতা যেদিন দেবীতীর্থে সন্দর্শন করিলাম, সেইদিন হইতে তাহার নিরাবরণ দেহের সৌষ্ঠব ও পুণ্যব্রত তাহার মনের সৌন্দর্য আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহার সেই রূপের চিন্তা দুরপনেয় ব্যাধির ন্যায় আমার সমস্ত শরীরের সূক্ষ্মতম স্নায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। হুতাশনের ন্যায় সেই চিন্তা আমার সমস্ত মনন-শক্তিকে নিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, কেবল আছে এই অন্তর্দাহ, যাহা তিলে তিলে আমাকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করিতেছে।'

সে বলিয়া চলিল তাহাব এই যন্ত্রণার শেষ পরিণতি যে মৃত্যু— এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র নাই, কারণ এই কুমারীকন্যার মধ্যে যে-রূপ ও গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহা কোনো মানুষের ভোগ্য হইবে ইহা তাহার চিন্তা ও কল্পনার বহির্ভূত। যে প্রেম কেবল দেবভোগ্য, মানুষ যদি সেই প্রেম লাভ করিবার জন্য বাসনার দ্বারা জর্জরিত হইতে থাকে তাহা হইলে মৃত্যু ছাড়া তাহার গতি নাই। 'আমি যদি খঞ্জনলোচনা সুশ্রোণিযুক্তা লাবণ্যময়ী এই সীতাকে লাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বঞ্চিত আত্মা যে দেহ হইতে বিমুক্ত হইবে ইহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার চিতাশয্যা প্রস্তুত করো। সুর-লোকের জন্য মর-লোকের যে আকাঙ্ক্ষা তাহা চিতাভস্মে পর্যবসিত হউক। তুমি আমার সহিত একই চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিতে চাহ ইহা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক, কারণ তোমার

কেশে বেশে ভাবে ভঙ্গিতে তরুণ জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট। কিন্তু তোমার এই ইচ্ছার পিছনেও সম্ভবত একটি যুক্তি-সংগত কারণ রহিয়াছে। তুমি যে সবল বাহুর শক্তি প্রয়োগে ইহাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে— সেই চিন্তা সর্বদা আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। এরূপ কোনো ব্যক্তি আমার মৃত্যুর অন্তে এই পৃথিবীতে বর্তমান থাকে ইহা আমার অভিপ্রেত বোধ হইতেছে না।'

শ্রীদমনের বক্তব্য শ্রবণ করা মাত্র নন্দ তাহার হতভম্ব বন্ধুকে আলিঙ্গন পূর্বক মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল এবং প্রগল্‌ভ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া বলিতে লাগিল :

'তাহাই বলো বন্ধু, প্রণয় প্রদাহ! কামাগ্নিতে দগ্ধ হইবার ফলে তোমার এই জর্জর অবস্থা! ইহাকেই তুমি মর্মান্তিক ব্যাধি বলিতে-ছিলে! হাঃ হাঃ হাঃ! এতদপেক্ষা হাস্যকর আর কিছুই হইতে পারে না।'

নন্দ অতঃপর মহানন্দে গান ধরিল :

পরমজ্ঞানী রসিক সুজন
পক্ব বুদ্ধি বিচারে
বিপাকে পড়িয়া তার
বুদ্ধি হইল মিছা রে।
সুনয়নীর নয়ন বাণে
তরল হৈল মাথার ঘি,
তরু হৈতে শাখা মৃগ
মাটির উপর পড়ল কি?

হাসিতে নন্দ ফাটিয়া পড়িবার দশা হইল। ঊরুদেশে সজোর চপেটাঘাত করিয়া সে বলিল :

'ভাই শ্রীদমন, প্রেমের বহ্নিতে তোমার হৃদয় খড়কুটার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং তজ্জন্য তুমি চিতার আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে চাহিতেছ— এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে পুলক আব

ধরিতেছে না। মায়াবিনী সেই দিন তোমার দৃষ্টিপথে বহুক্ষণ ছিল, সেই সুযোগে কামদেব ফুলশরে তোমার হৃদয় এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধিয়াছেন। তাঁহার সহিত এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন ঋতুরাজের সহচরী রতিদেবী। যাহা পুষ্পমধুলোভী ভ্রমর-গুঞ্জন সদৃশ মনে হইয়াছিল, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে পুষ্পধনুর টংকার, সে কথা তোমার আমার কল্পনায় উদয় হয় নাই। আহা, ইহা তো হইতেই পারে। এরূপ প্রত্যহই ঘটিয়া থাকে এবং পুরুষের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক তো নহেই, অপিচ আনন্দের কারণ। আর তুমি যে বলিতেছিলে এইরূপ প্রণয়সম্ভোগ কেবল দেবগণের জন্য, ইহা হইতে প্রমাণ হইল স্বয়ং কামদেব তোমার হৃদয়ে এই বাসনার বীজ বপন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানিও বন্ধু, এই লীলাখেলায় দেবতাদের ন্যায় মানুষেরও অধিকার রহিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা যথার্থই বলিতেছি। তুমি কামানলে উদ্দীপ্ত আছ বলিয়া তোমার নিকট এইসকল যুক্তি শীতল বলিয়া মনে হইবে। তত্রাচ বলি যদি তুমি স্থির করিয়া থাক যে তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে কেবল দেবতারাই শরসন্ধান করিতে পারিবেন— তাহা হইলে তুমি ভুল করিবে। এরূপ মনোভাব নিতান্তই বিনয়ের আতিশয্যপ্রসূত। এই যে হলরেখা— ইহাতে অনায়াসেই তুমি বীজ বপন করিতে পারিবে। (সীতা অর্থে হলরেখা দিয়ায় নন্দ এইরূপ ইঙ্গিত করিল)। কিন্তু প্রবাদে আছে না:

পেঁচা হয় দিনে কানা
কাক কানা রাতে
প্রেমে অন্ধ যেই জন
কানা দিনে রাতে।

তোমাকে এই গ্রাম্য ছড়া শুনাইবার উদ্দেশ্য এই যে তুমি যেন ইহার আলোকে নিজেকে দেখিতে পার। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিবে মহিষডাল গ্রামের এই কন্যাটিকে তীর্থকুণ্ডে বিবস্ত্র

অবস্থায় স্নান করিতে দেখিয়া তুমি যে ইহাকে দেবী বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলে— তাহা নিতান্তই তোমার কল্পনাপ্রসূত ভুল। বাস্তবিক পক্ষে সে নিতান্তই সাধারণ মেয়ে— অবশ্য সে সুন্দরী-রূপসী। কিন্তু সে অন্যান্য গ্রাম্য দুহিতার ন্যায় জাঁতায় গোধুম পিষে, উনানের ধারে বসিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করে এবং পশমের সুতা বুনে। গ্রামের অন্য পাঁচটি মেয়ের যেমন পিতামাতা, সীতারও তদ্রূপ। অবশ্য সুমন্ত্র বড়াই করিয়া বলে তাহার ধমনীতে এখনও ক্ষাত্রেয়ের রক্ত বহিতেছে। বহিলেও এতদিনে সেই ধারা নিশ্চয় নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকিবে। মোটকথা, তাহারা এমন কোনও ব্যক্তি নহেন যাহাদের নিকট দুই কথা না পাড়িতে পারা যায়। নন্দের ন্যায় বন্ধু তোমার যখন রহিয়াছে, কেনই বা সে তোমার আনন্দ বিধানের জন্য এই চিরাচরিত ঘটকালি-কর্ম হইতে বিরত থাকিবে। কি বল বন্ধু, চুপ করিয়া রহিলে যে? কি যে মূর্খের মত কথা বলিতেছিলে, চিতাশয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে। চিতানলে তোমার সহিত প্রবেশ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেক বেশি সহজ ও আনন্দের কারণ হইবে যদি সুশ্রোণীযুক্তা সুন্দরী বধূর সহিত একত্র শয়নের জন্য তোমার বাসর সজ্জা প্রস্তুত করিতে পারি।'

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর শ্রীদমন বলিল: 'তোমার কথায় এবং বিশেষত তোমার গানে আমার বিরক্তি উৎপাদনের সমূহ কারণ বিদ্যমান। আকুল আকাঙ্ক্ষার বেদনায় আমি মুহ্যমান, এ-ব্যথা আমার সহনাতিরিক্ত, আমার বক্ষ বিদীর্ণপ্রায়। অথচ তুমি বলিতেছ ইহা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং সচরাচর এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, যখন কামনার বেগের নিকট মানুষিক শক্তি পরাভূত হয়— তখন সেই আকাঙ্ক্ষাকে অতি-মানুষিক বা দৈবী বলিয়া অভিহিত করাই সংগত। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা তুমি আমার মঙ্গল চাহ, আমাকে প্রবোধ দিতে চাহ। সুতরাং আমার এই মর্মান্তিক দুঃখে তোমার ইতর-

জনোচিত হাস্য পরিহাস আমি মার্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। কেবল যে মার্জনা করিলাম তাহা নহে, পরিশেষে তুমি যে-সকল সম্ভাবনার কথা বলিলে তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মুমূর্ষু হৃদয়ে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। তুমি যে সুখের ছবি আমার চক্ষে ধরিলে — ইহা এমন একটি সম্ভাবনা, যাহা এক্ষণে আমার প্রতীতির অতীত। মাঝে মাঝে আমার মনে হইতেছে যে যাহারা আমার ন্যায় বেদনার্ত নহে, তাহারা হয়তো অসংপৃক্ত দৃষ্টি দ্বারা এইপ্রকার সম্ভাবনা দেখিতে পায়। কিন্তু আমার নিকট ইহা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। আমার নিকট এক্ষণে যে-সম্ভাবনা বিদ্যমান তাহা অনিবার্য মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাবিয়া দেখ, হয়তো নাবালিকা অবস্থায় সীতাদেবী প্রতিবেশী অঞ্চলস্থ কোনো বালকের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়া থাকিবেন। এইপ্রকার কোনও সম্ভাবনার বিষয় চিন্তামাত্র আমার বক্ষে যন্ত্রণার প্রদাহ জ্বলিয়া উঠে এবং মনে হয় একমাত্র চিতাগ্নিতে আহুতি দান ব্যতিরেকে আমার আর গত্যন্তর নাই।

নন্দ তাহাদের বন্ধুত্বের দিব্য দিয়া বলিল এই প্রকার সম্ভাবনা নিতান্তই অমূলক ও ভিত্তিলেশহীন। সীতা কাহারও কাছে বাগ্‌দত্তা নহে। পিতা সুমন্ত্র এইরূপ বাগ্‌দানের ঘোরতর বিপক্ষে; কারণ বাগ্‌দত্ত বালকের অকালবিয়োগ হইলে সীতাকে বৈধব্যদশার কলঙ্ক বহন করিতে হইবে। বাগ্‌দত্তা হইলে সূর্যকুমারীরূপে সীতাকে নির্বাচন করা সম্ভবপর হইত না। সীতা অপ্রাপনীয়া নহে, পরন্তু তাহাকে লাভ করিতে হইলে চেষ্টাচরিত্র করিতে হইবে। শ্রীদমন উচ্চজাতি সম্ভূত, তাহার আত্মীয়-কুটুম্বাদি সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তি, এতদ্ব্যতীত সে বেদজ্ঞ। সুতরাং সে যদি তাহার বন্ধুকে ঘটকালির কাজে নিযুক্ত করে এবং বন্ধুও যদি উভয় পরিবারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্‌যোগী হয়, তাহা হইলে এই বিবাহ তো একপ্রকার সিদ্ধই হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

নন্দ যে উৎক্ষপণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল ইহাতে শ্রীদমন খুব যে পুলকিত হইল, মনে হইল না। তাহার মুখে একটি অব্যক্ত বেদনার ছায়াপাত হইল। কিন্তু বয়স্য যে সংকটে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত এই প্রস্তাবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সীতাকে বধূরূপে তাহার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতে পারিবে— এইপ্রকার সম্ভাবনা কল্পনার অতীত মনে করিয়া সে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে নন্দের অকাট্য যুক্তি তাহার সম্ভাব্য মনে হইতে লাগিল। তথাপি সে নন্দকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিল যে বিবাহ-সম্বন্ধ যদি কোনো কারণে নিস্ফল হয়, তবে নন্দ যেন তাহার সবল বাহু দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিতে দ্বিধা না করে। গর্গপুত্র বন্ধুর দুশ্চিন্তা প্রশমিত করার জন্য প্রতিশ্রুত হইল সত্য, কিন্তু কোন কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় এবং শ্রীদমনের সহিত সীতার মিলন কিভাবে সংঘটিত হইতে পারে— এই জল্পনা তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। প্রথমেই স্থির হইল শ্রীদমন কোনো কথায় থাকিবে না, সে কেবল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। নন্দ প্রথমে শ্রীদমনের পিতা ভবভূতির নিকট কথা পাড়িবে ও কন্যাপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনায় তাহাকে সম্মত করাইবে। অতঃপর নন্দ পাণিপ্রার্থীর প্রতিনিধিরূপে মহিষডালের কন্যার সম্মুখে সমাগত হইবে এবং বয়স্যরূপে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের জন্য যত্নবান হইবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বণিক্ ভবভূতি পুত্রের বন্ধুর প্রস্তাব শুনিয়া সানন্দে সম্মতি দান করিল। যৌতুক ও উপঢৌকনের প্রাচুর্যবশতঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব গোপালক সুমন্ত্রও বিশেষ কোনো বিরাগ প্রকাশ করিল না। নন্দ কন্যাপক্ষের নিকট তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরল প্রগল্‌ভতার সহিত স্বীয় বন্ধুর প্রচুর গুণকীর্তন করিল। বরপক্ষের সহিত পরিচয়ের জন্য সীতার পিতামাতা ধেনু-কল্যাণ গ্রামে ভ্রমণ করিতে আসিল। এইরূপ দেখাশুনা-পরিচয়ের মধ্য দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। সীতাও দূর হইতে তাহার ভবিষ্যৎ

স্বামী বণিক্‌পুত্র শ্রীদমনকে এক পলক দেখিয়া লইল। বাগ্‌দান ও পানপাত্র পর্ব সমাপ্ত হইল, দুই পরিবারে বিচিত্র উপহার দেওয়া-নেওয়া হইল। বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্যচূষ্য ভোজন করিল। অবশেষে গ্রহাচার্যগণের পরামর্শে বিবাহের জন্য শুভদিন নির্দিষ্ট হইল। নন্দ পরম উৎসাহে জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। গোময়লিপ্ত যজ্ঞবেদীতে সুমন্ত্রের গৃহপ্রাঙ্গণে হোমাগ্নি জ্বলিল। নন্দ তাহার সবল বাহুদ্বয়ের দ্বারা যথাপ্রয়োজন যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিলেন।

চন্দন ও কর্পূর-সুবাসিত নারিকেল তৈল দ্বারা সীতার সুঠাম দেহ মর্দিত হইল। নানারূপ আভরণ ও সুন্দর বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া, সূক্ষ্ম তন্তুতে প্রস্তুত গুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সীতার সহিত শ্রীদমনের শুভদৃষ্টি বিনিময় হইল। শ্রীদমন পূর্বে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু বধূরূপে তাহাকে যেন নূতন করিয়া দেখিল। মন্ত্রপাঠ কালে প্রথম তাহারা পরস্পরের নিকট পরস্পরের নাম উচ্চারণ করিল। ঘৃত-তণ্ডুল দান করিয়া সীতার পিতার হস্ত হইতে সে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল 'অহং ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি'। বলিল 'দিব্যাহং পৃথিব্যাস্ত্বমসি, অহং বাচো ত্বং সংগীতম্।' সমবেত পুরললনাদের সংগীত ও করতালি ধ্বনির মধ্যে, সীতাকে অনুগামিনী করিয়া সে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিল। বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে পর, কতিপয় শ্বেতচর্ম বলীবর্দ বাহিত রথে আরোহণপূর্বক সে সীতাকে শোভাযাত্রা সহকারে স্বগ্রামে লইয়া আসিল এবং তাহার মাতার হস্তে নববধূকে সমর্পণ করিল।

এখানেও মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানাদির বিরাম নাই। এখানেও যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ, পরস্পরের হাতে গুড় ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ, অঙ্গুরীর বিনিময়। পাকস্পর্শ অনুষ্ঠানে বহু জ্ঞাতি-কুটুম্বের সমাগম হইল। নবদম্পতির পানাহার সমাপ্ত হইল, সুবাসিত গঙ্গাজলে তাহাদের অভিষেক হইল। অতঃপর সমবেত বন্ধু ও সখিগণ-সমভিব্যাহারে তাহারা বাসরগৃহে

সমাগত হইল। সেখানে তাহাদের জন্য ফুলশয্যা প্রস্তুত। চুম্বন আলিঙ্গন পরিহাস রোদন প্রভৃতির পালা শেষ হইল। একে একে অতিথিরা বিদায় লইলেন। সর্বশেষ যে-ব্যক্তি দেহলি অতিক্রম করিল, সে নন্দ।

॥ পাঁচ ॥

স্বচ্ছন্দগতি এই আখ্যানের ধারা অনুসরণ করিতে গিয়া পাঠক হয় তো আশা করিবেন এই গল্পের সূচনা যেরূপ উপসংহার ও হয়তো তদ্রূপ প্রীতিপদ হইবে। প্রকৃতপক্ষে সে অনুমান যে ভ্রমাত্মক তাহার বিষয়ে পূর্বাহ্ণেই পাঠককে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অদৃষ্ট নির্বাক্—তাহার বদনমণ্ডল সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। হইলেও আপাতদৃষ্টিতে যাহা মধুর মনে হয়, বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই মাধুর্য যেন বীভৎস কোন এক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তখন আতঙ্কে দেহ শিহরিয়া উঠে। চিত্ত বিকল হয়। তখন মানুষ হয় অনুভূতি-বিহীন জড়ত্বে পর্যবসিত হয়, নতুবা বিভ্রান্ত হইয়া আত্মঘাতী সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়। অদৃষ্টের এই বিপরীত মুখ দেখিয়াছিল শ্রীদমন, নন্দ ও সীতা, সেই যখন তাহারা একত্রে যাত্রা করিয়াছিল …। সে যাহা হউক, পরের কথা পরে হইবে।

শ্বশ্রূমাতা পরম সমাদরে সীতাকে আপন বক্ষে স্থান দিলেন। সূক্ষ্মনাসা শ্রীদমন সীতা হইতে বিবাহিত জীবনের পর্যাপ্ত আনন্দ সম্ভোগ করিল। এইরূপে একে একে ছয় মাস অতিবাহিত হইল। নিদাঘ ঋতু অবসিত হইলে পর মেঘমেদুর বর্ষার আকাশ হইতে প্রচুর বারিধারাপাতে পৃথিবী পুষ্পলাবণ্যে ভরপুর হইয়া উঠিল। ক্রমে শরতের সূর্যসংস্কৃত আকাশ শ্বেত শতদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে একদিন নববিবাহিত দম্পতি শ্রীদমনের পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে সীতার পিতৃগৃহে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। বন্ধু নন্দ উদ্‌যোগী হইয়া তাহাদের পহুঁছাইয়া দিবে এইরূপ স্থির হইল। সীমন্তিনী হইবার পর কন্যাকে সীতার পিতামাতা আর দেখেন নাই। কন্যা যে স্বামীসোহাগিনী হইয়া আনন্দে আছে

ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। যদিচ সীতা এখন সন্তানসম্ভবা, স্থির হইল যে অনুকূল ঋতুতে সামান্য পথ অতিক্রম করিয়া পিতৃগৃহে গমন তাহার পক্ষে ক্লেশসাধ্য হইবে না।

উষ্ট্র ও বলীবর্দ-বাহিত রথে আরোহণপূর্বক সীতা ও শ্রীদমন যাত্রা করিল। রথের উভয় পার্শ্বে ও ছাদে ঘেরাটোপ। রথের সারথি হইল নন্দ। তির্যক ভঙ্গিতে একটি শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া, পদদ্বয় দুই পার্শ্বে প্রলম্বিত করিয়া সে চালকের আসনে বসিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল রথচালনায় সে অতিমাত্র ব্যস্ত। ঘাড় ফিরাইয়া যে দুদণ্ড যাত্রীদের সহিত কথা বলিবে তাহারও যেন সময় নাই। কখনও সে উচ্চৈঃস্বরে বাহক পশুদিগকে তর্জন ভৎসনা করিতে লাগিল, কখনও বা কলকণ্ঠে গান জুড়িয়া দিল। তারস্বরে শুরু করিয়া তাহার কণ্ঠ ক্রমশ নামিতে নামিতে মৃদু গুঞ্জনে পর্যবসিত হইল। সূচনায় হৃদয়-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য যেরূপ সরবে অভিব্যক্ত হইল, সমাপ্তির ভাষাহীন আকূতি তাহার তুলনায় কোনো অংশে কম বিস্ময়কর নহে।

শকটের পশ্চাদ্ভাগে বিবাহিত দম্পতি নীরব। নন্দের পৃষ্ঠদেশ একেবারে তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে। সামনের দিকে সোজা দৃষ্টিপাত করিলে যাহা চক্ষে পড়ে তাহা হইল নন্দের পেশল গ্রীবা। তরুণী বধুর দৃষ্টি কখনও বা তাহার আপন ক্রোড়ের দিকে কখনও বা নন্দের এই গ্রীবার দিকে নিবদ্ধ। যদি বা চক্ষু একবার ফিরাইয়া লয়, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় দৃষ্টি সম্মুখ পানে ধাবিত হয়। শ্রীদমন যেন ইচ্ছা করিয়াই সম্মুখ দিকে চাহিতেছে না। তাহার দৃষ্টি রথের চাঁদোয়ার উপর বদ্ধ। নন্দের রথচালনার ভঙ্গিতে কেমন একটা বলিষ্ঠ সৌন্দর্য আছে। তাহার মেরুদণ্ড যেমন ঋজু তেমনি দৃঢ়। বাহুর আন্দোলনে সুগঠিত স্কন্ধদ্বয়ের পেশীগুলি কেমন যেন অবলীলায় খেলিতেছে। সম্ভবপর হইলে নন্দের এই পৃষ্ঠদেশ হইতে সীতার নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করিবার জন্য, শ্রীদমন নন্দের সহিত স্থান

পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্থানপরিবর্তনে কী প্রয়োজন, তাহাতে তো সমস্যার সমাধান হইত না। রথের আরোহীত্রয় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। তিন জনেরই চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে, যেন এইমাত্র তাহারা দ্রুত ধাবন করিয়া আসিয়াছে। এইসকল লক্ষণ সুলক্ষণ নহে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কোনো ব্যক্তি যদি এই সময় ইহাদের এই অবস্থায় দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত ইহাদের উপর যেন কী-এক করাল সম্ভাবনার কুটিল ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

মধ্যাহ্নের প্রখর তপনতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা অতি প্রত্যুষে, উষা সমাগমের পূর্বেই আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইলেও, দিনের আলো হইতে রক্ষা পাইবার এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণার মধ্যে আত্মগোপনের একটা ইচ্ছা লুকাইয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা আর যাহাই হউক, সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। তাহাদের অন্তরস্থিত সংশয় ও মোহের পক্ষে অন্ধকার প্রশস্ত। এই নিশাচরণ প্রকৃতপক্ষে অন্তরের এই সংকোচেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। যে-পথে মোড় ঘুরিলে সীতার পিতৃগৃহের পথ সুগম হয়, নন্দ সেই পথে রথ চালনা করিতে ভুলিয়া গেল। নিশ্চন্দ্র আকাশ, তারার আলোকে কতটুকু পথই বা লক্ষ্যগোচর হয়। যথাস্থানে নন্দ ভুল পথে মোড় ঘুরিল। কিয়ৎ পরে দেখা গেল সে রাস্তা রাস্তাই নহে। তরুশ্রেণীর মধ্যেকার গুল্মবিহীন এই বীথিকা ক্রমশ গভীর অরণ্যের মধ্যে তাহাদের আনিয়া ফেলিল। দেখা গেল পিছনে ফিরিবার পথটুকুও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দুইপার্শ্বে বৃক্ষকাণ্ড, তন্মধ্যে নরম মাটির একটি ফালি। চলিতে গিয়া গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে বলিল, তাহারা ভুল পথে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ভুল যে তাহাদের মনের প্রতিচ্ছবি, ইহা পরস্পর হইতে গোপন করিল।

রথের চালক নন্দের পিছনে আসীন শ্রীদমন ও সীতার যে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল এমন নহে। একপ্রকার খোলা চোখেই, যেন দেখিয়াও দেখে নাই এইভাবে, নন্দকে তাহারা ভুল পথে আসিতে দিয়াছে, নিষেধ করে নাই।

এখন কি আর করা যায়। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত, বন্যপশুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালানো হইল, অবশেষে রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে পর, তাহারা এদিকে ওদিকে পথের সন্ধানে বাহির হইল। বাহক পশুগুলিকে যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া, শিশু ও চন্দন তরুর ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহারা অতিকষ্টে রথ ঠেলিয়া অরণ্যের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে আসিয়া পৌঁছিল সেখানে প্রস্তরাকীর্ণ একটি গিরিবর্ত্ম, অপ্রশস্ত হইলেও রথ এখানে চলিবে বলিয়া মনে হইল। নন্দ বলিল, এই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলে নিশ্চিত সীতার গৃহে পহুঁছানো যাইবে।

গিরিবর্ত্মের উপলখণ্ডে ক্রমাগত ধাক্কা খাইতে খাইতে রথ যে-স্থানে আসিয়া থামিল, তাহার অদূরে প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত একটি দেবী-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা মহামায়া মহাকালীর মন্দির। মন্দির দর্শনে শ্রীদমনের মনে কেমন যেন ভাবাবেগ উপস্থিত হইল। সে দেবীকে পূজা দিবার উদ্দেশ্যে রথ হইতে অবতরণ করিল, বলিল, 'একবার কেবল দর্শন করিয়া পূজা দিয়া অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিব। তোমরা এইস্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করো।' পাথরের গা কাটিয়া অসমান কয়েকটি ধাপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীদমন সেই সোপানশ্রেণী ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

এই যে মন্দির— স্বর্ণমক্ষী নদীর জনহীন ঘাটের নিকট অবস্থিত সেই যে দেবীমন্দির, তদপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য অধিক হইবে না। তবে ইহার স্তম্ভ ও খিলানগুলিতে যে-সকল সূক্ষ্ম কারুকার্য ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় এগুলি বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

মন্দিরের দ্বার যেন পর্বতের অভ্যন্তরে থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে। যে স্তম্ভের উপর এই দ্বার প্রতিষ্ঠিত তাহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত চিত্রব্যাঘ্র মুখ ব্যাদন করিয়া হিংস্রভাবে দণ্ডায়মান। প্রবেশকক্ষের দক্ষিণে ও বামে ও মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে, পর্বতগাত্র হইতে ক্ষোদিত নানাবিধ মূর্তি। অস্থি মাংসের যে স্থূল জীবন, যাহা মেদ মজ্জা রেতঃ স্বেদ বাত পিত্তঃ কফ মলমূত্রকে আশ্রয় করিয়া গঠিত; কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা হতাশা বিরহ মিলন ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র রূপে বিধৃত, সেই উদ্দাম জীবন যেন কোনো মহাধমনীর রক্তস্রোত হইতে শক্তি আহরণ করিয়া এখানে অজস্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশু মানব দেব দানব যক্ষ রক্ষের এই বিরাট রঙ্গভূমিতে, কখনও দেখা যায় হস্তীর শুণ্ড মানুষের হস্তে পরিণত, কখনো বা সুগঠিত নারীদেহের উপর শূকরের মুখ। শ্রীদমন যেন বলপূর্বক এইসকল মূর্তি দেখিবে না পণ করিয়াছে। কিন্তু আরক্ত নয়ন বিরত হইতে পারিল কই? দেখিতে দেখিতে যেন তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, অকারণ করুণায় হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, মন প্রস্তুত হইল দেবীসন্দর্শনের জন্য।

দিনের বেলাতেও এই গুহার অভ্যন্তরে প্রদোষ অন্ধকার। সভা-মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া শ্রীদমন কয়েক ধাপ নীচে সংলগ্ন চত্বরে পা দিল। তাহারও কয়েক ধাপ নীচে একটি সংকীর্ণ প্রবেশদ্বার। এই দ্বার অতিক্রম করিলে পর মন্দিরের গর্ভগৃহ।

শেষ ধাপে পা দিয়া শ্রীদমন চমকিয়া উঠিল, দুই পা পিছাইয়া গিয়া যেখানে হস্ত রাখিল তাহা একটি শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরে কালীর করালীমূর্তি। ইহা কি তাহার আরক্ত চক্ষুর ভ্রম, না কি ইহার পূর্বে আর কোথাও সে এরূপ দৃপ্ত ভয়ংকরী মূর্তিতে কালীকে দেখে নাই? বিগ্রহের চতুর্দিকে ছিন্ন হস্ত ছিন্ন পদের একটি অর্ধ-বৃত্তাকার তোরণ। তাহার সম্মুখে গুহা-অভ্যন্তরের সমস্ত রঙ আত্মসাৎ করিয়া যেন ঘোর কৃষ্ণ কালীমূর্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার

মাথার মুকুট উজ্জ্বল মণিরত্নখচিত, দেখিলে চক্ষু ঝলসিত হয়। পরিধানে তাঁহার ছিন্নহস্তের মেখলা। দেবীর অষ্টাদশভুজ যেন চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে। কোনো হাতে তরবারি কোনো হাতে বা প্রদীপ্ত মশাল। ওষ্ঠের নিকট করোটির পাত্র, তাজা রক্ত তাহাতে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। পদতলে রক্তের স্রোত বহিতেছে, মনে হইতেছে যেন ভয়ংকরী অস্তিত্বের উত্তাল সমুদ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে বহন করিয়া যেন শোণিত-সাগরে তরণী ভাসিয়া চলিতেছে। শ্রীদমনের সূক্ষ্ম নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া রক্তের ঘ্রাণ অনুভূত হইতেছে। গুহার অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলের পথ সংকীর্ণ। এই বদ্ধ হাওয়ায়, ভূমিগর্ভস্থিত এই মৃত্যুলোকে কত যে জীববলি সংঘটিত হইয়াছে, কে জানে। কত ছিন্নমস্তক প্রাণীর রক্ত এই সকল প্রস্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সেই রক্তের সোঁদা ও মিষ্ট এক-প্রকার গন্ধে এই স্থানের বায়ু মন্থর। এতদ্দণ্ডে মন্দিরতল সদ্যো-নিহত মহিষ, শূকর ও ছাগ-রক্তে পিচ্ছিল। উৎসর্গীকৃত এইরূপ চার-পাঁচটি মুণ্ড নিস্তারিণীর বেদীর সম্মুখে স্তূপীকৃত। এইসকল মুণ্ডের বিস্ফারিত চক্ষু স্ফটিকের ন্যায় জ্বলিতেছে, চক্ষুতারকা অন্তর্হিত। বলিদানের ক্ষুরধার খড়্গের উপর বিন্দু বিন্দু রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। বেদীর নিম্নে ছিন্নমুণ্ডগুলির নিকট সেই খর্পর শায়িত।

শ্রীদমন বিশালাক্ষীর রণোন্মাদিনী মূর্তির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্রমবর্ধমান আতঙ্কে তাহার প্রতি রোমকূপ হইতে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। ইনিই সেই দেবী, সেই জন্মমৃত্যু-বিধায়িত্রী, বলিযজ্ঞের পূজায় যাহার অধিকার অবিসংবাদিত। ইহার ঘূর্ণায়মান অষ্টাদশ ভুজ দেখিয়া শ্রীদমনের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে যেন নেশা করিয়াছে। স্পন্দমান বক্ষের ভিতর রক্ত-স্রোতের বন্যা বহিতেছে— কখনও হিমশীতল কখনও বা তরল অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। দুই মুষ্টি বদ্ধ করিয়া সে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিল। মস্তিষ্কে, নাভিমূলে, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় একটি মাত্র অনিবার্য

আবেগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল ঐ অনন্ত-যোনির সেবায় আপনার প্রাণ নিঃশেষ উৎসর্গ না করিলেই যেন নহে। রক্তলেশহীন ওষ্ঠপুট হইতে অস্ফুট প্রার্থনা উদ্‌গত হইতে লাগিল :

'হে আদ্যাশক্তি! এইসকল জগৎ চরাচর সৃষ্টির অতীত কালেও তুমি বর্তমান ছিলে। মাতা তুমি, অথচ কোনো পুরুষ তোমাকে ভোগ করে নাই, কেহ তোমার লজ্জাবস্ত্র উন্মোচন করে নাই। সকল ভয়ের ভয়, সকল কামনার কামনা, রূপময় সমস্ত জগৎ-চরাচর তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়া আবার তোমাতেই প্রবেশ করে। জীববলি দিয়া লোকে তোমার পূজা করে। কারণ যে রক্ত-প্রবাহ জীবনকে ধারণ করে, সে তো তোমারই দান। নিজেকে যদি তোমার নিকট উৎসর্গ করি, আমরা সকল জ্বালাযন্ত্রণার উপশমস্বরূপ তোমার দয়া কি পাইব না? আত্মবলি দিয়া জন্মান্তর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব না, সে আমি জানি। কিন্তু ঐ তোমার যোনিদ্বার দিয়া আবার একবার তোমার মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে দাও, মাতঃ। জননীজঠরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া আমি যেন আমার আমিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আর যেন আমাকে এই শ্রীদমনরূপে থাকিতে না হয়। ইহার নিকট সমস্ত কামনা বাসনা মরীচিকা সদৃশ, কারণ তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় ইহার হাতে নাই।'

এত বলিয়া সে শাণিত খড়্গ তুলিয়া লইল এবং এক আঘাতে গ্রীবামূল হইতে আপনার শিরশ্ছেদ করিল।

আখ্যান বর্ণনা করিতে যতটুকু সময় লাগিল, ঘটনা ঘটিতে তাহার চেয়ে খুব যে বিলম্ব হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু এইস্থানে আখ্যান-কারের পক্ষ হইতে একটি প্রসঙ্গ স্পষ্ট করিয়া লওয়া ভাল। এই যে আপনার শিরশ্ছেদপূর্বক আত্মহনন— ঘটনারূপে ইহা নূতন নহে। কিংবদন্তি কিংবা ইতিহাসে ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও নিবেদন, এই কাহিনীর শ্রোতা কিংবা পাঠক শ্রীদমনের শিরশ্ছেদরূপ বিশেষ ঘটনাকে অন্য অনুরূপ ঘটনার সহিত তুলনা যেন

না করেন; যেন না বলেন 'এমন তো সচরাচর ঘটিয়াই থাকে।' বিশেষ ঘটনা কখনও এমন হইতে পারে না যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। জন্ম মৃত্যু তো অহরহঃ ঘটিতেছে। কিন্তু প্রসব-বেদনায় কাতর প্রসূতি কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া থাকুন। নিজেকে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন করিয়া দেখুন জন্ম-মৃত্যু সাধারণ ঘটনা কি না। আপন হাতে আপনার শিরশ্ছেদন অনন্যসাধারণ ঘটনা না হইতে পারে; কিন্তু এই কার্যকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই আতিশয্য। সত্য বলিতে কি, ইহা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত, কারণ চিত্ত ও সংকল্পের একান্ত দৃঢ়তা না থাকিলে এই কার্যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কোমল দৃষ্টি ও ক্ষীণ বাহুবল-সম্পন্ন ক্ষুদ্রকায় ব্রাহ্মণ হইয়াও শ্রীদমন যে তাহার সংকল্প সাধন করিতে পারিল, ইহা সামান্য ঘটনা নহে, পরন্তু ইহা অবিশ্বাস্যরূপে ভয়াবহ।

সে যাহাই হউক, যাহা ঘটিবার ঘটিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে শ্রীদমন আপনাকে বলি দিল। একপার্শ্বে কোমলশ্মশ্রু-শোভিত তাহার খণ্ডিত সুগঠিত মুণ্ড পড়িয়া রহিল। তাহার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল উন্নত শীর্ষদেহের পরিবাহক তাহার নিতান্ত নগণ্য দেহখানা। সদ্যোরক্তস্নাত খর্পর এই কবন্ধের করধৃত হইয়া মসীকৃষ্ণ গুহা-অভ্যন্তরে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। গ্রীবাদেশ হইতে উদ্গত শোণিতের ধারায় মন্দিরতল প্লাবিত হইল। যে-বেদীর উপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, তাহা অপ্রশস্ত নয়ানজুলিদ্বারা পরিবেষ্টিত, মন্দিরতল এইস্থানে অপেক্ষাকৃত গভীর। ফলে রক্তের ধারা মন্দির-তল বাহিয়া এই বেদীর দিকে দ্রুত ধাবিত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন স্বর্ণমক্ষী নদী হিমবন্ত পর্বতের প্রাচীর ভেদ করিয়া তুরন্ত অশ্বশাবকের ন্যায় ছুটিয়া চলিতেছে। নয়ানজুলির মোহানায় আসিয়া এই স্রোতের গতি মন্থর হইয়া আসিল— মনে হইল নদী যেন মহা-সমুদ্রে বিলীন হইতেছে।

মন্দির-গুহার অভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একবার দেখা যাউক বাহিরে অপেক্ষমান দুইজনা কি করিতেছে। সূচনায় তাহারা পরস্পারের প্রতি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি। অতঃপর তাহাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন মুখর হইয়া উঠিল। শ্রীদমন তো পূজা-অর্চনা সারিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে বলিয়াছিল, তবে কেন এত বিলম্ব ঘটিতেছে? সুন্দরী সীতা এতক্ষণ নন্দের পশ্চাতে নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল। কখনও নন্দের পেশল পৃষ্ঠদেশ কখনও-বা আপন ক্রোড়ের প্রতি তাহার দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। স্থূল ওষ্ঠ ও হ্রস্বনাসা নন্দও এতক্ষণ বাহক পশুদিগের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নীরবে বসিয়া ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েই আর স্থির থাকিতে পারিল না। বয়স্য নন্দ যেন জোর করিয়াই সদ্যোপরিণীতা তরুণীর দিকে মুখ ঘুরাইয়া বসিল, কহিল :

'বলিতে পার কি, সে এতক্ষণ কী করিতেছে, কেনই-বা এতক্ষণ ধরিয়া আমাদের অপেক্ষা করাইয়া রাখিয়াছে?'

নন্দ যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই হইল, সীতার বীণানিন্দিত কণ্ঠে তাহার সমস্ত হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। কণ্ঠে এতখানি মধু ঢালিয়া দিবার তেমন প্রয়োজন ছিল না, যেমন ছিল না নন্দের নাম ধরিয়া ডাকিবার। তত্রাচ সীতা বলিল, 'নন্দ, কি কারণ এত বিলম্ব হইতেছে, কিছুই তো বুঝিতেছি না।' নন্দ কিন্তু সীতার নাম দূরে থাক, শ্রীদমনের নামটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করে নাই। সীতা বলিয়া চলিল, 'অনেকক্ষণ ধরিয়াই আমার মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল এবং তুমি যদি পিছন ফিরিয়া আমার দিকে না চাহিতে বা আমায় না জিজ্ঞাসা করিতে, আমিই তোমায় জিজ্ঞাসা করিতাম।'

বন্ধুর এই অযথা বিলম্বে বিমূঢ় বোধ করিবার জন্যই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক, নন্দ শিরশ্চালন করিয়া উঠিল। 'ফিরিয়া না চাহিতে' বলিলেই তো যথেষ্ট বলা হইত, তবে কেন সীতা বলিল 'আমার দিকে না চাহিতে।' ইহার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যতটুকু

না বলিলে নয় সীতা তাহার অধিক কথা বলে কেন ? আর শ্রীদমনের অনুপস্থিতিতে এইরূপ মধু ঢালা কথা বলা কি ভাল ?

নন্দ কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভারি ভয় পাছে সীতার অনুসরণে তাহার কণ্ঠেও মধুর ভাবের সঞ্চার হয় এবং সে সীতাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলে। কিয়ৎক্ষণ পরে সীতাই প্রস্তাব করিল :

'আমি বলি কি, নন্দ, তুমি বরঞ্চ একবার গিয়া দেখিয়া আইস সে কোথায় এবং কি করিতেছে। যদি পূজার্চনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার সবল বাহু দিয়া তাহাকে একবার ঝাঁকুনি দিতে পার। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ করিবে। আমরা তো আর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। অদ্ভুত মানুষ— অনর্থক আমাদের এখানে বসাইয়া রাখিয়াছে। এমনিতেই পথভ্রমের নিমিত্ত আমাদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আরও যদি বিলম্ব হয় তাহা হইলে আমার পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার অবধি থাকিবে না। পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা প্রিয়তর তাহাদের তো আর কিছু নাই। নন্দ, তোমার আমায় মাথার দিব্য তুমি একবার গিয়া তাহাকে লইয়া আইস। আর সে যদি আসিতে না চায় কিংবা আসিতে অপত্তি করে তাহা হইলে বলপ্রয়োগে তাহাকে ধরিয়া আনিবে। গায়ের জোরে তো সে তোমার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে না!'

নন্দ কহিল :

'আচ্ছা, আমি তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আসি। জোর করিতে যাইব কেন, বন্ধুভাবে বলিলেই হইবে— সময় বহিয়া যাইতেছে। পথভুল তো আমার জন্যই হইয়াছিল। আমি তাহার খোঁজে যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। ইতস্ততঃ করিতেছিলাম এইজন্য যে তুমি হয়তো এখানে একাকিনী বসিয়া থাকিতে চাহিবে না। ভয় নাই, আমি যাইব আর আসিব।'

এত বলিয়া নন্দ চালকের আসন হইতে অবতরণ করিল ও মন্দির-অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মন্দির-অভ্যন্তরে কি দৃশ্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, ইহা তো আমরা অবগত আছি। আমরাও নন্দের অনুগমন করি। সভাগৃহ অবধি সে তো নির্বিবাদে চলিল, মন্দির-চত্বরে পৌঁছিয়াও তাহার কিছু মনে হইল না। অবশেষে সে প্রবেশ করিল গর্ভগৃহে, যেখানে দেবীর বিগ্রহ। এখানে সে চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরমুহূর্তে আতঙ্কে সে অস্ফুটশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীদমনের ন্যায় সেও শিবলিঙ্গের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহার ভয়ের কারণ ঘোরকৃষ্ণ মহাকালী মূর্তি নহে, পরন্তু মন্দিরতলে সন্দর্শিত বীভৎস দৃশ্য। সেখানে তাহার বন্ধুর রক্তলেশহীন ছিন্ন মুণ্ড, কবন্ধ হইতে শত ধারায় রক্তস্রোত বেদীনিম্নের কুণ্ড অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

করীকর্ণের ন্যায় নন্দের সমস্ত শরীর দুলিয়া উঠিল। দুই হাতের নানা অঙ্গুরীয় শোভিত কৃষ্ণ অঙ্গুলি দ্বারা সে নিজের গণ্ড চাপিয়া ধরিল। স্থূল ওষ্ঠাধর হইতে বারংবার বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। নতজানু হইয়া সে শ্রীদমনের দ্বিখণ্ডিত দেহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কোন্ অংশকে জড়াইয়া ধরিবে, কাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে —সে যেন স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে যে-শীর্ষদেশ সর্বদা বন্ধুর উত্তমাঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইত, সেই ছিন্ন মুণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া সে কাতরোক্তি করিতে লাগিল। হা হুতাশ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তাহার অজনাসা-সংবলিত মুখখানিও বড় করুণ বোধ হইতে লাগিল। কখনো শীর্ষের দিকে কখনো বা অধোদেশের দিকে চাহিয়া, সে বালতে লাগিল :

'হায় বন্ধু শ্রীদমন, ইহা তুমি কি করিলে! তোমার ওই বাহুর সাহায্যে কি করিয়াই বা এমন দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলে। কেহ তো এই কার্যে তোমাকে প্ররোচনা দেয় নাই। আপন মনের

তাগিদে আপনার হাতে তুমি আপনাকে বিসর্জন দিলে। এতদিন আমি তোমার মন, তোমার বুদ্ধিমত্তার গুণগান করিয়াছি। আজ সাশ্রুনয়নে তোমার এই শরীরকেও অভিনন্দিত করি, কারণ দেহের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন সেইরূপ দুরূহ কাজ তোমার এই দেহ সাধন করিয়াছে। কিন্তু, এ কার্য তুমি কিরূপে করিতে পারিলে? তোমার অন্তরে কত-না দুঃখ-শোক, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত মহৎ ভাবের আন্দোলন, আহিতাগ্নির ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তবেই না এভাবে নিজেকে আহুতি দিতে সমর্থ হইলে! তোমার ওই সুন্দর দেহ হইতে সুঠাম মস্তক কিরূপে তুমি বিচ্ছিন্ন কারতে পারিলে! তোমার ঈষৎ পীন উদর তো এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু উন্নত শীর্ষদেশের সহিত সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় এই অধোভাগ যেন অর্থহীনরূপে প্রতীত হইতেছে! বলো বন্ধু, তোমার এই চরম কার্যের জন্য আমিই কি দায়ী? কার্যতঃ না হইলেও আমার এই সত্তাই কি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধী? আমার মস্তিষ্কে যে-সব চিন্তা জাগিতেছে সে কি তোমার ভাবনারই প্রতিফলন? তুমি বিজ্ঞ ব্যক্তি, তোমার বিচারে হয়তো এই আমার সত্তার অপরাধ কৃতকর্মের অপরাধ হইতে ন্যূন নহে। কিন্তু কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া ব্যতীত মানুষ অধিক আর কি করিতে পারে? পাছে আমার কণ্ঠে মধুর রসের সঞ্চার হয়, সেই আশঙ্কায় আমি তো যথাসম্ভব নীরবে ছিলাম। প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি বাক্যও তো আমি কহি নাই এমন-কি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া যখন কথা বলিয়াছি, তাহার নামও উচ্চারণ করি নাই। ভগবান সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি, সে যখন তোমার বিষয়ে লঘুভাবে কথা বলিয়াছিল, তখন তাহার সমথনে একটি কথাও আমি উচ্চারণ করি নাই। জানি না এত কথায় কী প্রয়োজন, আমার রক্ত-মাংসের এই সত্তাই আমার অপরাধের হেতু। আমার উচিত ছিল লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জন মরুভূমিতে কৃচ্ছ্রসাধন। পরম পরিতাপের সহিত স্বীকার করি, তুমি এ-বিষয়ে একটি কথাও যদি

না বলিতে, তথাপি এরূপ সন্ন্যাস অবলম্বনই আমার পক্ষে প্রকৃষ্ট হইত। স্বপক্ষে আমি কেবল এইটুকুই বলিতে পারি যে তোমার ইচ্ছা যদি ভাষায় ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কথা আমি রাখিতাম। হায় ছিন্নমুণ্ড, হায়, দেহ হইতে এইরূপে খণ্ডিত হইবার পূর্বে কেন এ-কথা বল নাই? এতদিন আমাদের দুইমাথা একত্র করিয়া আমরা বুদ্ধি পরামর্শ করিয়াছি— বিদ্যাবুদ্ধি তো আমার সামান্য, সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি তোমারই ছিল। আজ এই দুর্দিনে, কই, তুমি তো বুদ্ধি পরামর্শ দিবার জন্য উপস্থিত রহিলে না। চুপ করিয়া রহিলে! সময় আর নাই, নাই-বা তুমি আর কথা কহিলে। নিজের প্রতি নির্দয় হইয়াও তুমি যে মহৎকর্ম সম্পাদন করিলে, তবে তাহাই আমার দৃষ্টান্ত হউক। বাক্যে তোমাকে অনুসরণ করিতে না পারিলেও কর্মে তো পারিব। তুমি নিশ্চিত জানিতে তো বন্ধু, কর্মক্ষেত্রে আমি তোমার পশ্চাৎপদ থাকিব না। দুর্বল বাহুদ্বারা তুমি যে-কাজ সাধন করিয়াছ, আমার সবল বাহু কি তাহা হইতে বিরত হইতে পারে? কত বার তো তোমাকে বলিয়াছি তোমা-হইতে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে পারিব না। কামাগ্নিতে জর্জর হইয়া সেই যখন তুমি চিতাশয্যা সজ্জিত করিতে বলিয়াছিলে, তখন কি তোমাকে বলি নাই আমিও তোমার সহিত সহমরণে যাইব। নিয়তি তোমার সহিত আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে— ইহা পূর্ব হইতেই আমি জানিতাম। এক্ষণে তোমায় দ্বিখণ্ডিত-দেহ দেখিয়া আমার মনের সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। মুহূর্তেকের মধ্যে আমি বুঝিলাম নন্দের স্থিরসংকল্প হইতে কেহ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিতে তো প্রস্তুতই ছিলাম, এখন নাহয় তোমার ন্যায় রক্তমোক্ষণ বশতঃ মরিব। মৃত্যু ব্যতীত আমার যে কোনো গতি নাই। বাহিরে গিয়া একবার তাহাকে কি বলিয়া আসিব, তুমি কি করিয়াছ? আতঙ্কে সে যখন চীৎকার করিয়া উঠিবে, হয়তো সেই চীৎকারে তাহার প্রচ্ছন্ন আনন্দ প্রকাশ পাইবে। না, মৃত্যুই আমার

একমাত্র গতি। আমি যদি জীবন লইয়া ফিরি, লোকে নিশ্চয় দূষিবে, বলিবে 'নন্দ পাষণ্ড, নন্দ পামর। বন্ধুর প্রতি কৃতঘ্নতা করিয়াছে। বন্ধু-পত্নীর প্রতি কামাতুর হইয়া বন্ধুকে হত্যা করিয়াছে।' না, না, না, কিছুতেই না। আমি তোমারই অনুবর্তী হইব বন্ধু। জগতের যিনি যোনিস্বরূপা—সেই জগন্মাতা তোমার এবং আমার রক্ত একত্রে পান করিয়া তৃপ্ত হউন।'

এত বলিয়া সে শ্রীদমনের মুণ্ড হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করিল। মৃতদেহের বজ্রমুষ্টিতে ধৃত শাণিত খর্পরের হাতল অল্পে অল্পে ছাড়াইয়া লইল। পেশল বাহুর সাহায্যে নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজহস্তে নিপুণভাবে সম্পন্ন করিল। প্রথমে দেহখানা পড়িল শ্রীদমনের দেহের উপর। শাদাসিধা মস্তকটি গড়াইতে গড়াইতে বন্ধুর মস্তকের নিকট গিয়া যখন থামিল, তখন নন্দের দুই চক্ষু উলটাইয়া গেছে। গোড়ায় ফিনৃকি দিয়া গল গল করিয়া রক্ত বাহির হইল। অল্পে অল্পে ধারাবেগ মন্দীভূত হইল। শ্রীদমনের রক্ত যে-পথে প্রবাহিত হইয়া বেদীনিম্নের কুণ্ডে সঞ্চিত হইয়া ছিল, নন্দের রক্তধারাও সেই পথের অনুগমন করিল।

॥ ছয় ॥

সীতা অর্থে হলরেখা, শস্য প্রসব করার উদ্দেশ্যে যে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত হয় সেই ভূমি হইল সীতা। মন্দির-অভ্যন্তরে যতক্ষণে রোমহর্ষকর নানারূপ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সেই সময় সীতা ঘেরা-টোপ আচ্ছাদিত শকটে একাকিনী বসিয়া আছে। তাহার যেন সময় আর কাটিতেছে না, নন্দের পেশল পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া সে সময় অতি-বাহিত করিবে, তাহার উপায় নাই। সে ইহাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত বোধ করিতেছে। অহো, সীতা জানে না যে-গ্রীবা দেখিয়া তাহার মনে কত-না ভাবাবেগের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন শানিত খর্পরে খণ্ডিত হইয়া তাহা ভূলুণ্ঠিত। অন্তরে অন্তরে রাগ-অভিমান ব্যতীত আর একটি অনুভূতির উদয় হইতে লাগিল, সংশয় জাগিল হয়তো সাংঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। অশান্ত চিত্তের প্রকাশরূপে সীতার পেলব চরণ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। সম্প্রতি এই নবোঢ়া যুবতী এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইতেছে যে, তাহার মন এইরূপ সম্ভাবনার বিষয় কল্পনা করিবে—ইহাতে আর বিচিত্র কি। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক জল্পনা কল্পনা তাহার চিন্তাকে অধিকার করিল। অন্তরের ভাব যাহাই হউক-না কেন, সীতা তাহার নিজের কাছেও তাহা যেন গোপন রাখিল। মনে মনে সে বলিল :

'অসহ্য, অসহ্য, এ কি অন্যায়। পুরুষ জাতি সব এক, ইহাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই। একজন তো অপর জনাকে এখানে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। এজন্য তাহাকে কি যে বলা যায় জানি না। অপর জনাকে যদি বা তাহার সন্ধানে পাঠাইলে—তাহার আর ফিরিবার নাম নাই। তুমি এখন একাকিনী রৌদ্র মাথায় করিয়া

বসিয়া থাক। কত যে সময় নষ্ট হইল তাহার ঠিক নাই। সূর্য তো এখন মধ্যাহ্নে। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিতেছে। সারাব্রহ্মাণ্ড ঢুঁড়িয়া এমন একটি সুযুক্তি মিলিবে না যাহার বলে একে একে এই দুই ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইতে পারে। একমাত্র সম্ভাবনা যাহা আমার মনে উদয় হইতেছে তাহা এই: পূজানিরত শ্রীদমন হয়তো মন্দির হইতে বাহির হইতে চাহিতেছে না, আর নন্দ হয়তো তাহাকে বাহিরে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেছে। শ্রীদমন দুর্বল বলিয়া সম্ভবত নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। নন্দের বাহুতে তো প্রচণ্ড শক্তি, মাংসপেশী যেন লৌহ দ্বারা গড়া। ইচ্ছা করিলে সে তো শ্রীদমনকে শিশুর মত কোলে করিয়া লইয়া আসিতে পারে। অবশ্য ইহাতে শ্রীদমনের গৌরবহানি হইবে। কিন্তু বসিয়া বসিয়া আমার এমনই বিরক্ত ধরিয়াছে, যে এক-একবার ইচ্ছা হইতেছে যেন নন্দ এইরূপই করুক। নাঃ, আমি যদি স্বয়ং বল্গাধারণ করিয়া একাকিনী রথ চালাইয়া পিতৃগৃহ অভিমুখে চলিয়া যাই এবং বাহিরে আসিয়া ইহারা যদি দেখে আমি আর এখানে নাই— তাহা হইলে সমুচিত শিক্ষা হয়। স্বামী ও তাহার বয়স্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি যদি নিঃসঙ্গ অবস্থায় পিতৃগৃহে উপাস্থিত হই তাহা হইলে হাস্যাস্পদ হইব। নতুবা আমার খুবই ইচ্ছা হইতেছে রথ চালনা করিয়া চলিয়া যাইতে। আর যাহা করিতে পারি, যাহা অগৌণে আমার করা কর্তব্য, তাহা হইল ইহাদের অনুসরণ করা এবং ইহারা কি করিতেছে তাহার সন্ধান লওয়া। আমার জঠরে সন্তান রহিয়াছে, সেইজন্যই হয়তো ইহাদের অদ্ভুত আচরণে আমার মনে ভয়াবেগ হইতেছে। কি কারণ এরূপ হইতে পারে ভাবিয়া আকুল হইতেছি। কি আবার হইবে? নিশ্চয় কোনো অজ্ঞাত কারণে ইহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ইহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে। দেখি, আমি উপস্থিত হইয়া কলহ মিটাইতে পারি কিনা।’

এইরূপ চিন্তিয়া সুন্দরী সীতা শকট হইতে অবতরণ করিল। মেখলার নিম্নে তাহার সুগঠিত নিতম্ব উদ্বেলিত হইল। সে মন্দিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মুহূর্ত পরে কি বীভৎস দৃশ্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল— তাহা তো আমরা অবগত আছি।

আতঙ্কে তাহার বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত হইল, বিস্ফারিত চক্ষু যেন অক্ষিকোটর হইতে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিল, তাহার অচৈতন্য দেহ মন্দিরতলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পতিত হইল। কিন্তু যে ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা তো আর প্রত্যাহৃত হইবার নহে। সীতা যতক্ষণ শকটে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ততক্ষণ এই পরিস্থিতিও তাঁহার অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া ছিল। সীতার জ্ঞানোদয় হইবার পরও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটিল না। সে আর একবার মূর্ছা যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু পোড়া শরীর এমনই শক্ত যে মূর্ছা যাইতে পারিল না। তখন সে দুই হাতে নিজের কেশ আকর্ষণ করিয়া প্রস্তর নির্মিত মন্দিরতলে মাথা কুটিতে লাগিল। বিস্ফারিত চক্ষে সে ছিন্ন মস্তক, পরস্পরের উপর লম্বমান দুইটি দেহ ও শোণিতের ক্ষীণীয়মান ধারা দেখিতে লাগিল। আতঙ্কে তাহার ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল :

'হা বিধাতা! হা দেবসকল, দ্বিজ সকল, দেখ, আমার কি দুর্দশা ঘটিল। আমার আর উদ্ধার নাই। দুইজনই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! হোমাগ্নি সাক্ষ্য করিয়া যিনি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উন্নত ছিল যাহার শীর্ষ এবং যাঁহার দেহের (সে যেমনই হউক-না কেন), উত্তাপে আমার কামনার উদ্রেক হইত, বিবাহান্তে যিনি প্রতি রাত্রে আমাকে রতিক্রীড়ায় দীক্ষা দিয়াছিলেন ও এই বিদ্যায় সাধ্যমত পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই আমার পতি শ্রীদমন—আজ তাহার কি দশা। আজ তাঁহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ধুলায় লুটাইতেছে। আমার তাহা হইলে কি আর রহিল, কিছুই রহিল না। কিছু

না। কিছু না। আর এই যে অপর জন, নন্দ— সবল বাহু দ্বারা যে আমাকে উর্ধ্বে উৎক্ষেপ করিয়াছিল, বয়স্য শ্রীদমনের পক্ষ হইতে যে আমার পাণি প্রার্থী হইয়া আমার পিতৃগৃহে গিয়াছিল ওই তো তাহার ছিন্ন মুণ্ড, রক্তস্নাত প্রাণহীন দেহ। ওই তো তাহার বক্ষঃপটে বৎসতরের পুচ্ছের ন্যায় কোমল রোমরাজি এখনও শোভা পাইতেছে। আনন্দ-মূর্তি নন্দের আজ একি দশা। এই মুণ্ডহীন দেহ আমি এখন স্পর্শ করিতে পারি, ইহার সুগঠিত ও পেশল বাহু ও জঙ্ঘাদ্বয় ইচ্ছা করিলেই আমি অনুভব করিতে পারি। কিন্তু নাঃ, প্রয়োজন নাই। ইতিপূর্বে যেমন শ্রীদমনের প্রতি ইহার বন্ধুবাৎসল্য আমার বাসনাকে প্রতিহত করিয়াছে, তেমন মৃত্যু এখন তাহার ও আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দিয়াছে। কি কারণে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় পরস্পরের প্রতি ইহাদের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহা আর আমার নিকট অগোচর নাই। অনিবার্য সংঘর্ষের ইহাই পরিণাম— ইহা তো আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি! কিন্তু খড়্গ তো দ্বিতীয় নাই। একমাত্র অস্ত্র এবং তাহাও নন্দের করধৃত। একটি খড়্গের সাহায্যে তাহারা কিরূপে পরস্পরকে হনন করিল? প্রাজ্ঞ ও কোমলস্বভাব শ্রীদমন কি আত্মবিস্মৃত হইয়া অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক নন্দের শিরশ্ছেদ করিল। অতঃপর নন্দ কি···। না, না, তাহা কিরূপে সম্ভবে? নন্দই এমন কোনো কারণে যাহা অনুমান করিলেও ত্রাসে আমার অঙ্গ কম্পিত হয়, প্রথমে শ্রীদমনকে হত্যা করিল। তৎপরে সে···। না না না, আর অনুমানে প্রয়োজন নাই। জল্পনা কল্পনায় কি লাভ? এই ভয়াবহ অন্ধকূপের মধ্যে একমাত্র সত্য হইল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ও তন্মধ্যে রক্তের প্লাবন। কেবল এইটুকুই সত্য যে ইহারা গর্হিত ও বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছে, আমার বিষয় ভাবিয়াও দেখে নাই। না, ঠিক তাহা নহে, তাহা হইতে পারে না। ইহারা নিশ্চয় আমার কথা ভাবিয়াই পুরুষ-জনোচিত এই বীভৎস জীঘাংসায় লিপ্ত হইয়াছিল। আহা, সে কথা ভাবিলেও আমার সমস্ত অন্তর শিহরিয়া উঠে। আমার কথা ভাবিয়া-

ছিল সত্যই, কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় নিজেদের সহিত সংযুক্ত করিয়া ভাবিয়া থাকিবে। ঈর্ষার উন্মাদনায় ইহারা ভাবে নাই আমি কি করিব, আমার কি হইবে। এই যে ছিন্নশির দুইটি শব নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে, ইহারা কি বলিয়া দিবে অতঃপর আমি কি করিতে পারি। কি আর করিব? এখন আমি বেকার। বৈধব্য জীবন যাপন করিতে পারিব কি? সারা জীবন ধরিয়া লোকে দূষিবে ও বলিবে এই দুঃশীলা রমণীর দোষে ইহার স্বামী আত্মঘাতী হইয়াছে। অনাথা বিধবার অদৃষ্টে এইরূপ গঞ্জনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পোড়া মুখ লইয়া কিরূপে পিতা কিংবা শ্বশুরের গৃহে যাইতে পারি? যদি যাই তো কলঙ্কের অবধি থাকিবে না। অস্ত্র যেখানে একটি মাত্র, ইহারা তো আগে পরে পরস্পরকে হনন করিতে পারে নাই। নিশ্চয় কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল এবং আমি ছাড়া আর কেহ সেই তৃতীয় ব্যক্তি হইতে পারে না। লোকে বলিবে ভ্রষ্টা নারী কেবল স্বামীকে হত্যা করিয়া বিরত হয় নাই, স্বামীর বয়স্যকেও হত্যা করিয়াছে।'

'সাক্ষ্যপ্রমাণের তো অভাব নাই— এরূপ অবিসংবাদিত প্রমাণ আর কোথায় পাওয়া যাইবে। সুতরাং বিনা অপরাধে তাহারা আমাকে হত্যাকারী বলিয়া চিহ্নিত করিবে। নির্দোষ? নিজেকে নির্দোষ কিরূপে বলিব। মিথ্যার আশ্রয় লইব কেন, তাহাঁতে কি লাভ? যাহার কিছু নাই, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে মিথ্যাচার মূঢ়তা। সরলহৃদয় নির্দোষ আমি নহি— এই সরলার সারল্য অনেক দিন পূর্বেই ঘুচিয়া গিয়াছে। আর এইভাবে পরিত্যক্ত হওয়া? নিশ্চয় ইহার যুক্তিসংগত কারণ আছে— একাধিক কারণ। কিন্তু সে গূঢ় কারণগুলি লোকে বুঝিবে না। ভুল বিচার ঘটিতে দিব না, আমার নিজের বিচার নিজেই করিব। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার কি আর রহিল আমার? আমিও তবে উহাদের অনুসরণ করি। আমার এই কোমল হস্তে খড়্গ ধারণ করিতে পারিব না। এই যে আমার সুঠাম সুন্দর তনু—

ইহাকে আঘাত করিতে গেলে আমার বাহুদ্বয় কলঙ্কিত হইবে। কিছু নহে, সমস্তই চিত্তের দুর্বলতা। কিন্তু এই যে সৌন্দর্যরাশি ইহাও তো তাহা হইলে এই দুটি শবদেহের ন্যায় নির্জীব পাষাণে পরিণত হইবে। ইহা হইতে কামনার উদ্রেক হইবে না, কামনা চরিতার্থও করিতে পারিবে না। তবে আর কেন, যাহা অনিবার্য তাহা ঘটুক। কিন্তু বলির সংখ্যা আরও এক বাড়িয়া চারে দাঁড়াইবে। ক্ষতি কি? পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুর বাঁচিয়া লাভ কি? দুরদৃষ্ট হইবে ইহার নিত্যসঙ্গি। সম্ভবতঃ ইহার শরীর হইবে রক্ত-লেশহীন পাণ্ডুর, চক্ষে হয়তো দৃষ্টি থাকিবে না। যখন এই শিশু সঞ্জাত হইল তখন যন্ত্রণা ও ভয়ে আমার সমস্ত শরীর পাণ্ডুর। আমি জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলাম পাছে এই সন্তানের জন্মদাতাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। আমার কোনও দায় নাই। ইহারা যে-কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছে তাহাই করিতে চলিয়াছি মাত্র। একবার দেখুক তাহারা, আমি এমন অবলা সরলা নহি যে আমার কর্তব্য হইতে বিরত হইব।'

সীতা একপ্রকার যেন জোর করিয়া গাত্রোত্থান করিল। স্খলিত পদে অগ্রসর হইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিল। অতঃপর আত্মহত্যায় বদ্ধপরিকর হইয়া মন্দিরের বহিঃস্থিত উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটিয়া চলিল। এই স্থানে ছিল একটি জটাজুট সংবলিত বটবৃক্ষ। একটি লতা লইয়া সে ফাঁস প্রস্তুত করিল। উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য সে তখন প্রস্তুত।

॥ সাত ॥

এমন সময়ে আকাশ হইতে বাণী ভাসিয়া আসিল। স্বয়ং জন্মদাতার কণ্ঠনিঃসৃত এই বাণী—সেই যিনি মুনিগণের ধ্যানের অগম্যা দুর্গা, জ্ঞানের অগোচর বলিয়া যিনি মহাকালী। কন্যার আচরণে বিরক্ত হইলে মাতার কণ্ঠে যেরূপ রূঢ় তিরস্কারের সুর বাজিয়া উঠে, এই গম্ভীর নির্ঘোষে সেই সুর যেন বাজিয়া উঠিল।

'তিষ্ঠ, নির্বোধ রমণী। আমার সন্তানদ্বয়ের রক্ত পান করিয়াও তৃপ্ত হইলি না, পাপীয়সী। আবার আসিয়াছিস এই তরুশাখা কলঙ্কিত করিতে? আমার নারীত্বের প্রতীক ওই তোর বরতনু শকুন-শৃগালের ভোজ্য করিতে? তোর শরীরের উষ্ণতায় যে একটি কোমল প্রাণ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে শুদ্ধ বিসর্জন দিতে অসিয়াছিস? জানিস না কি তোর রজস্বলা হইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে? আমার সন্তান তোর মধ্যে উদ্‌গত হইয়া তোকে সন্তানবতী করিয়াছে। স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা স্বতঃপ্রমাণিত তাহা যদি না বুঝিয়া থাকিস, তাহা হইলে যা, গিয়া গলায় দড়ি দিঁয়া মর্। কিন্তু আমার এই চত্বরে কেন হতভাগিনী! এই মন্দির প্রাঙ্গণে আমি ভ্রূণ হত্যা, শিশু হত্যা হইতে দিব না। যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই তো তোর বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে। এমনিতেই নির্বোধ দার্শনিকদের কলহ-কচকচিতে আমার কর্ণপটহ বিদীর্ণপ্রায়। নির্বোধগুলা বলে কি না অস্তিত্ব একপ্রকার সংক্রামক রোগ। রতিসংসর্গের ফলে নাকি এক প্রজন্ম হইতে অন্য প্রজন্মে এই রোগের বীজ সংক্রমিত হয়। এক্ষণে তুই শুদ্ধ যদি এখানে মরণ-খেলা খেলিতে আসিস, তাহা আমার সহ্য হইবে না। লতার ফাঁস হইতে এই মুহূর্তে যদি তোর গলা মুক্ত না করিস তাহা হইলে তোর কপালে আছে আচ্ছা করিয়া কর্ণমর্দন।'

এই তিরস্কারের উত্তরে সীতা কহিল :

'প্রণিপাত করি তোমায়, হে দেবি, তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য। বজ্রনির্ঘোষে যেইমাত্র তোমার বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিল তদ্দণ্ডে আমি স্থির করিয়াছি এই দুঃসাহসিক কার্য হইতে আমি বিরত হইব। কিন্তু আমার গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবিষয়ে তুমি যে ইঙ্গিত করিলে, তাহা তো যথার্থ নহে, মাতঃ। আমার ঋতু যে বন্ধ হইয়াছে ও তোমার আশীর্বাদে তোমার সন্তানের বীর্য যে আমার মধ্যে উদ্‌গত হইয়াছে— ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। আমি কেবল আশঙ্কা করিতেছিলাম এই শিশু দুরদৃষ্ট হইবে, রক্তাল্পতা ও দৃষ্টিশক্তির হীনতা ইহাকে আক্রান্ত করিবে।'

'দুঃশীলে, সে প্রশ্ন বিচারের ভার আমার, তোমার নহে। তাহা ছাড়া ইহা নিতান্তই মেয়েলি কুসংস্কার এবং দ্বিতীয়তঃ আমার এই সৃষ্টিতে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ সকলের জন্যই স্থান রহিয়াছে। এক্ষণে তোর স্বপক্ষে কোন সুযুক্তি আছে, বল্ দেখি দুর্ভাগিনী। বল্ শুনি, কি কারণে আমার দুই শক্তসমর্থ যুবক সন্তানের রক্ত মন্দিরতল প্লাবিত করিয়া আমার চরণনিম্নস্থ কুণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত হইল। এ কথা সত্য, এই রক্ত আমারই দান। আর সেইজন্যই তো আমার ইচ্ছা ছিল আরও অধিক কাল ধরিয়া যেন এই রক্ত ইহাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। আশা করি তোর বুঝিতে বাকি নাই, আমার নিকট কোনো জিনিস অজানা নহে।'

'মাতঃ, ইহারা তো পরস্পরকে হনন করিয়া আমাকে একাকিনী রাখিয়া গিয়াছে। আমাকে লইয়া কলহ করিতে করিতে একই অস্ত্রে পরস্পরের মস্তক...'

'মুর্খ! মেয়েমানুষ না হইলে এরূপ উদ্ভট জল্পনা তোর মনে উদয় হইত না। জানিয়া রাখিস পুণ্যলাভের জন্য পুরুষ প্রাণ দিতে পারে। ইহারাও তেমনই আমার চরণে নিজেদের বলি দিয়াছে। কিন্তু বলি দিতে গেল কেন?'

সুন্দরী সীতার চক্ষে অশ্রু প্লাবিত হইল। সে কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল :

'দেবি, সকল কথাই আমি অবগত আছি। দোষ যে আমারই, সে কথা আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমার কি আর অন্য উপায় ছিল? দুরদৃষ্ট হইলেও যাহা দুর্নিবার তাহা হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাই? তোমার নিকট বলিতে বাধা নাই (এই কথা বলিতে গিয়া সীতার কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল) আমার দুর্দশার সীমা রহিল না, আমার সমস্ত জীবন বিষময় হইয়া উঠিল, যে-মুহূর্তে আমার বিবাহ হইল। পিতৃগৃহে যখন আমি সরলা অবোলা বালিকামাত্র ছিলাম, তখন আমি বেশ ছিলাম। বিবাহ হইল, স্বামীসহবাস ঘটিল, তোমার এই প্রজনন কর্মে দীক্ষা লাভ করিলাম— তৎসঙ্গে আমার কপাল পুড়িল। শিশু যদি ক্রীড়াচ্ছলে বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে তাহার যে-দশা হয়, আমারও সেই দশা হইল। শরীরে মনে অভূতপূর্ব সে যে কী মোহের আগুনে জ্বলিলাম, সেই অনির্বাণ লালসার জ্বালা আমার নিকট পরম রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। আবার যে সেই শিশুসুলভ সরলতা-অজ্ঞানতাময় রাজ্যে প্রবেশ করিব— তেমন আমার ইচ্ছাও নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে। আমি কেবল এতটুকুই বলিতে পারি যতদিন পুরুষ সন্দর্শন না করিয়াছি, পুরুষের সহবাস না করিয়াছি, ততদিন সে আমাকে জ্বালাতন করে নাই, আমার চিত্ত অধিকার করে নাই, ততদিন পুরুষের রহস্য লইয়া আমার মনে কোনো ঔৎসুক্য জাগে নাই। বরঞ্চ পুরুষ যখন ঠাট্টাবিদ্রূপাদি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে লীলাভরে দুই-চার কথা শুনাইয়াও দিয়াছি। তখন তো তরুণ যুবকের অনাবৃত বক্ষপট, পেশল হস্তপদ-সন্দর্শনে লজ্জায় লাল হই নাই। না, তখন এ-সমস্তই আমার নিকট অকিঞ্চিৎকর ছিল। অনুদ্বেলিত আমার সেই কুমারী হৃদয় ছিল অনাঘ্রাত পুষ্পকোরকের মতো। ধেনুকল্যাণ গ্রাম হইতে নন্দ-নামধেয় এক তরুণ আমাদের গ্রামে বেড়াইতে আসিল। তাহার

আঁখিপক্ষ্ম ঘনকৃষ্ণ, অনুচ্চ নাসা, তাহার দেহখানা যেন পাথর কুঁদিয়া নির্মিত। সে যখন মার্তণ্ড উৎসবে সূর্যকুমারীরূপে আমাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তখন আমি আমার মধ্যে কোনো ভাববৈলক্ষণ্য অনুভব করি নাই। হাঁ, দেহের মধ্যে একপ্রকার উষ্ণতা সঞ্চারিত হইয়াছিল সত্য। কিন্তু সে তো নিতান্তই বাতাবরণের তাপ। আমার বেশ স্মরণ আছে আকাশে উৎক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া বালিকাসুলভ চপলতায় দুই আঙ্গুলে তাহার খর্বাকৃতি নাসিকাখানি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছিলাম। ওই পর্যন্ত। অতঃপর সে তাহার বয়স্য শ্রীদমনের হইয়া ঘটকালি করিতে আসিল। আমার পিতামাতা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তখন হইতে আমার চিত্তে কেমন একটা নূতন ভাবের উদ্রেক হইল। নন্দ আসিল অপরের প্রেম নিবেদন বহন করিয়া। তাহার ঘটকালিতে মন যখন জাগিল তখন যাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিব সে সেখানে নাই—আছে কেবল নন্দ।

'সর্বত্র নন্দময়। বিবাহের পূর্বে ঘটকালির নন্দ, বিবাহ-উৎসবের ভোজ্য-পরিবেশনে নন্দ, অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া সপ্তপদী গমনের সময়ও, সেই নন্দ। বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু নন্দ রহিয়া গেল। ফুলশয্যাব সমস্ত দিন বন্ধুগৃহে অতিবাহন করিয়া রাত্রে সে নিজগৃহে ফিরিয়া গেল। সেই রাত্রে গন্ধ-মাল্য-চন্দন-চেলিতে সুসজ্জিত হইয়া দেব-দেবীর মত আমরা সর্বপ্রথম একত্রে ফুলশয্যায় মিলিত হইলাম। সেইরাত্রে আমার কুমারীদশা ঘুচিল। শ্রীদমনের কঠিন পৌরুষ আমার কুমারীসুলভ ব্রীড়ার আবরণ ছিন্ন করিল। যৌনকর্ম যে কী বস্তু সে তাহা অবশ্যই জানিত। কেনই বা জানিবে না মাতঃ, সে তো তোমারই সন্তান। আমাদের এই দৈহিক মিলনের স্বপক্ষে আধ্যাত্মিক যুক্তি প্রয়োগ করিতেও সে অদ্বিতীয় ছিল। এমন কিছু ঘটে নাই যাহার জন্য তাহাকে আমার প্রেম দিতে কিংবা মানসম্ভ্রম দিতে, বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারিত। পরন্তু তিনি আমার পতি, সুতরাং দেবতুল্য। সুন্দর সুগঠিত তাঁহার আনন, চিবুকের নিম্নে তাঁহার

কপিশ কোমল শ্মশ্রু, কোমল তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি, কোমল তাঁহার দেহসৌষ্ঠব, তত্রাচ, তাঁহাকে সমীহ করা সত্ত্বেও, আমার মনে ক্রমাগত এই প্রশ্ন জাগিত— ইনিই কি সত্য আমার প্রাণেশ্বর হইবার যোগ্য, ইঁহার নিকট হইতেই কি আমার কুমারীসুলভ লজ্জা বিসর্জন দিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায়, সেই বিষয়ে পাঠ লইতে হইবে? আমার কেবলি মনে হইত এই কার্য তাঁহার যোগ্য নহে, ইহা তাঁহার পক্ষে গ্লানিকর। তাঁহার উন্নত শীর্ষদেশের সহিত অধঃকৃশ শরীরের কেমন যেন সংগতি নাই। পরিণীত জীবনের সেইসকল রাত্রে যখন তাঁহার উদ্দীপ্ত কামনা আমাকে স্পর্শ করিত, তখন মনে হইত কী লজ্জা, কী লজ্জা! এই মার্জিতরুচি ব্যক্তিকে এইসব হীন কর্ম কি মানায়! আসঙ্গলিপ্সায় আমি স্বয়ং যখন কাতর হইয়া পড়িতাম, তখনও আমার মনের গ্লানি ঘুচিতে চাহিত না। ত্রিকালেশ্বরী, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। ভৎ´সনা কর, শাস্তি দাও, তথাপি এই চরম মুহূর্তে তোমা-কর্তৃক প্রাণিত এই জীব কি করিয়া তোমার নিকট সত্য গোপন রাখিবে? সর্বজ্ঞ তুমি মাতঃ, তোমার কাছে তো কিছু গোপন নাই। শ্রীদমন মানী লোক, তিনি মাথায় থাকুন, কিন্তু দৈহিক কামনা তাঁহাকে মানাইত না। না মানাইত তাঁহার মাথায়, না তাঁহার দেহে। তুমি তো নিশ্চয় স্বীকার করিবে মাতঃ. ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের ক্ষেত্রে মাথা অপেক্ষা শরীর বড়া। মন্দির-অভ্যন্তরে দেখিয়া আসিলাম তাঁহার ছিন্ন দেহখানা। কী অবিশ্বাস্যরকমের অকিঞ্চিৎকর এই শরীর। সমস্ত চিত্ত আবেগে উদ্‌বেগে উন্মথিত করিয়া দিবার মত মৈথুনবিদ্যা এই শরীরের আয়ত্তীভূত ছিল না। আমার কামনা উদ্দীপিত করার কৌশল তাহার জানা ছিল, কিন্তু কিরূপে তাহা প্রশমিত করিতে হয়, সে তাহা জানিত না। মার্জনা করো মাতঃ, সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঈপ্সা যে-পরিমাণ জাগিত তৃপ্তি সে-পরিমাণে লাভ করিতে পারি নাই। ফলে ক্ষুধাই বাড়িয়াছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই।'

'সারা দিনমান ধরিয়া, যতক্ষণ-না রাত্র হইয়াছে ও শয়ন করিতে গিয়াছি, বয়স্য নন্দকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি। কেবল তাহার হ্রস্ব নাসা নয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। পুরুষমানুষকে কিভাবে দেখিতে হয়, বিচার করিতে হয় বিবাহের ফলে ততদিনে আমার বোধায়ত্ত হইয়াছে। এক্ষণে শয়নে স্বপ্নে জাগরণে তন্দ্রায় আমার মনে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল : 'আমার স্বামী শ্রীদমনের ন্যায় এ ব্যক্তি বাক্‌পটু না হইতে পারে, কিন্তু ইহার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলে না জানি কেমন লাগিবে।' নিজেকে তর্জনা করিয়া বলিতাম : 'হতভাগিনি নির্লজ্জে, স্বামীর বিষয়ে এরূপ জঘন্য চিন্তা তোর মাথায় আসিল কিভাবে। মিথুনকর্মে কোনো ইতরবিশেষ নাই; সকলের পক্ষে তাহা একই প্রকার। এতদ্ব্যতীত তোর যিনি পতি, তিনি সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি। নন্দ বাক্যে কর্মে দেহের গঠনে নিতান্তই সহজ সরল সাধারণ মানুষ। সে কি করিয়া এই কাজে শ্রীদমন হইতে দক্ষ হইবে!' কিন্তু মন মানিত না। মন বলিত নন্দ এমন এক পুরুষ, যাহার শরীর ও মন উভয়ই রতিক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল। একার্যে তাহার লজ্জাবোধ কিংবা গ্লানিবোধ হইবে না। হয়তো সে আমার হৃদয়ে যে-পরিমাণ সংগমলিপ্সা জাগরূক করিবে, তদনুরূপ চরিতার্থতাও দান করিতে পারিবে। এই সম্ভাবনা আমার শরীর ও মনে এমনভাবে বিঁধিয়া গেল—যেন বঁড়শির কাঁটা। মৎস্য যতই মুক্ত হইতে ছটফট করিতে থাকে, বঁড়শির কাঁটা ততই তাহার শরীরের গভীরে প্রবেশ করে। আমার ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।'

'কী করিয়া এ কাঁটা খুলিতে পারি, মাতঃ? ও যে সর্বক্ষণই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিত। বিপরীত প্রকৃতি বলিয়া নাকি শ্রীদমন ও নন্দ একদণ্ড পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিত না। দিবাভাগে উহাকে দেখিতাম বাস্তবে, রাত্রে উহাকে দেখিতাম স্বপ্নে। শ্রীদমনকে স্বপ্নে দেখিবার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না, কারণ আমরা উভয়ে তো

একই শয্যায় শয়ান। উহার প্রশস্ত বক্ষপটের সেই কোমল চিক্কন রোমরাজি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতাম। উহার কোমর ছিল সরু, পশ্চাদ্দেশ সংকীর্ণ। আমার নিতম্বের তুলনায় কত ছোট! শ্রীদমনের পশ্চাদ্দেশের পরিধি ছিল নন্দ ও আমার মাঝামাঝি। এইসব দেখিতাম, মনে মনে তুলনা করিতাম আর আমার চিত্ত অধীর উতলা হইয়া উঠিত। উহার হাত যদি অকস্মাৎ আমার হাত স্পর্শ করিত, তাহা হইলে আমার রোমহর্ষের সঞ্চার হইত। দেখিতাম শ্যামলবর্ণ উহার সুগঠিত মজবুত রোমশ দুই পায়ে নন্দ চলাফেরা করিতেছে। রতিক্রিয়ার সময় উহার ওই দুই পায়ের গাঢ় আলিঙ্গনে আমার অধোভাগ মর্দিত মথিত হইতেছে— ইহা কল্পনা করিলেই আমি অন্ধকার দেখিতাম, আমার কুচাগ্র স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিত। প্রতি-দিন নন্দ আমার নিকট যেন আরও সুন্দর, আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। সেই-যে মার্তণ্ড উৎসবে সে যখন আমাকে দুই সবল বাহুর দ্বারা উৎক্ষেপ করিয়াছিল, যখন উহার চিক্কণ ত্বকের স্বেদ ও সর্ষপ তৈলের সুগন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন আমি যে কী করিয়া অবিচলিত ছিলাম, এই কথা ভাবিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইত। এক্ষণে যতই তাহাকে দেখিতে লাগিলাম ততই মনে হইতে লাগিল অপার্থিব সৌন্দর্যে সে যেন গন্ধর্ব চিত্ররথের তুল্য। যেন নন্দনকাননের সুগন্ধি-সেবিত পারিজাতমাল্য ধারণ করিয়া, তারুণ্য ও চিত্তহারী সৌন্দর্যের প্রতীক হইয়া, সহাস্যবদন কন্দর্প আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, মনে হইত যেন স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতার-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'এইরূপে হইল কি, রাত্রে যখন শ্রীদমন আমাতে উপগত হইতে উদ্যত হইত, আমার দেহের রক্ত যেন হিমশীতল হইয়া যাইত। আমি কেবলি ভাবিতাম যদি শ্রীদমন না হইয়া এ-ব্যক্তি নন্দ হইত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে করিতাম যেন নন্দই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে। অবশেষে আবেগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ দাঁড়াইল

যে আমি বিশেষ মুহূর্তে অস্ফুট স্বরে নন্দের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। শ্রীদমনের আর বুঝিতে বাকি রহিল না তাহার কোমল বাহুবদ্ধ অবস্থায় আমি কাহার স্মৃতি ধ্যান করিতেছি। আমার সতীত্বে তাহার এইরূপে সন্দেহ জাগ্রত হইল। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি স্বপ্নে কথা বলিতে অভ্যস্ত ছিলাম। স্বপ্নের ঘোরে আমার যে-সকল সুপ্ত বাসনা প্রকট হইত, তাহা শুনিয়া শ্রীদমন নিশ্চয়ই মর্মান্তিক আঘাত পাইত। তাহার বিষাদগ্রস্ত আচরণ এবং আমা হইতে তাহার দূরে দূরে থাকা হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম সে সব কথা জানিতে পারিয়াছে। এই সময় হইতে সে আর আমার সংসর্গ করে নাই। তা বলিয়া যে নন্দ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা নহে। ইহা নহে যে সে আমাকে কামনা করে নাই, কামনা যে তাহার যথেষ্ট ছিল— এ কথা আমার অবিদিত নাই। আমি দিব্য দিয়া বলিতে পারি কামনা তাহার অন্তরে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বন্ধুত্বের মর্যাদা সে প্রাণ থাকিতে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না পণ করিয়াছিল বলিয়াই কামলিপ্সা সে দমন করিয়াছিল। বিশ্বাস করো ত্রিকালেশ্বরী, সে যদি তাহার প্রবৃত্তির নিকট পরাভূত হইয়া আমার নিকট আসিত, তাহা হইলে আমার প্রভু আমার স্বামীর প্রতি আনুগত্যবশত আমি তাহাকে বিমুখ করিতে পশ্চাৎপদ হইতাম না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে স্বামী বলিতে যাহা বুঝায়, তৎকালে আমার সেরূপ কেহ ছিল না। আমরা তিনটি প্রাণীই তখন হইতে একপ্রকার ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আসিতেছিলাম।

'জগদম্বে, এই প্রকার যৎকালে আমাদের মানসিক অবস্থা, সেই সময় আমার পিতৃগৃহে যাইবার পথে, পথশ্রমে আমরা তোমার মন্দিরের সমীপবর্তী হইলাম। শ্রীদমন বলিল চলতি পথে অল্পক্ষণের নিমিত্ত সে তোমাকে পূজা নিবেদন করিয়া আসিবে। কিন্তু ওই বলিদানের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, আপন অবস্থার কথা স্মরণ করতঃ সে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তোমার খর্পরের সাহায্যে কী

ভীষণ এক কাণ্ড করিয়া বসিল। আপন দেহ হইতে দেহের শীর্ষ তাহার যে উন্নত মস্তক— খর্পরের আঘাতে সে তাহা বিচ্ছিন্ন করিল। দেহ হইতে মাথা কাটিল, না মাথা হইতে দেহ— সে প্রশ্ন এই স্থলে অবান্তর। আসলে সে যাহা ঘটাইল, তাহা আমার এই হতভাগ্য বৈধব্য দশা। আত্মত্যাগের বেদনায় এই পাপিয়সীর প্রতি মমতা বশতঃই সে হয়তো আপনাকে বিসর্জন দিল। মহিমময়ী, সত্য কথা বলিতে কি, তোমার চরণে সে নিজেকে বলি দেয় নাই। বলি দিতে চাহিয়াছিল তাহার বয়স্য ও আমার কাছে— যাহাতে আমরা উভয়ে পরস্পরের দেহসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে পারি। অতঃপর নন্দ গেল তাহার বন্ধুকে খুঁজিতে। শ্রীদমনের এই আত্মোৎসর্গের অর্ঘ্য সে গ্রহণ করিতে পারিল না। সেও আপন শিরশ্ছেদ করিল, পড়িয়া থাকিল তাহার প্রাণহীন কৃষ্ণ দেহ যাহা নাকি এখন কাহারও কোনো কাজে লাগিবে না। আমার এখন বাঁচিয়া থাকিয়া কী লাভ, আমার এই দেহখানাই বা কোন্ কাজে আর লাগিবে? আমার স্বামী নাই, স্বামীর বয়স্য নাই— আমিও তো এক প্রকার কবন্ধবিশেষ। আমার এই দুঃখতাপের কারণ নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত কোনো দুষ্কৃতি। এত কথা বলিবার পর তোমার মনে কি মাতঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে, যে ইহজন্মের হাত হইতে রক্ষালাভ আমার এখন একমাত্র কাম্য।'

বজ্রনির্ঘোষে দেবী বলিলেন:

'তোর ঘটে যে বুদ্ধি বিন্দুমাত্র নাই, তোর কথায় এইটুকুই প্রমাণিত হইল। দুরপনেয় কৌতূহলবশতঃ নন্দের বিষয়ে তুই যে কল্পিত রূপ গড়িয়া তুলিয়াছিস, তাহা হাস্যাস্পদ। কর্মে আচরণে সে নিতান্তই আর-পাঁচজনের মত। তাহার ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট লক্ষাধিক আমার সন্তান পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই নন্দকে তুই কিনা বলিলি গন্ধর্ব! তুই দেখিতেছি নিতান্তই অনুকম্পার পাত্র।'

অতঃপর আকাশবাণীতে একটু যেন স্নেহের স্পর্শ লাগিল। দেবী বলিলেন:

'মাতৃরূপে আমি যখন বিচার করিয়া দেখি তখন আমার মনে হয় এই ইন্দ্রিয়লিপ্সা সত্যই অনুকম্পার যোগ্য। ইহা লইয়া লোকে বড়ই আতিশয্য করিয়া থাকে। কিন্তু সে যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রেই তো নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে!'

অতঃপর কণ্ঠস্বর কঠোরতর হইয়া উঠিল। দেবী হুঙ্কার দিয়া বলিলেন:

'হাঁ, বলিতে পারিস আমি তো স্বয়ং সংহারমূর্তি। আমার মধ্যে আবার নিয়ম-শৃঙ্খলা কোথায়? সেইজন্যই তো নিয়মের উপর আমি এত জোর দিয়া থাকি। বিশেষতঃ বিবাহ-নামক এই যে সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, ইহাকে সর্বতোভাবে পাপদোষ-মুক্ত রাখিতে হইবে— ইহাই আমার বিধান। আমার স্নেহ-ভাল-বাসাকে আমি যদি সংযত না রাখি, যদৃচ্ছ প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে সৃষ্টি তো রসাতলে যাইবে। তোর আচরণে আমি প্রীত হই নাই— এতটুকু বলিয়া যদি ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে কম বলা হইবে। একে তো তুই এই স্থলে উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া আমাকে সংকটে ফেলিবার চেষ্টায় ছিলি, উপরন্তু তুই তো নানারূপ অশিষ্টজনোচিত কথা আমাকে শুনাইলি। তুই আমায় বলিতে চাহিস যে 'আমার সন্তানদ্বয়ের এই যে প্রাণ উৎসর্জন— ইহা এইজন্য নহে যে তাহাদের জীবনশোণিত আমার বেদীনিম্নস্থ কুণ্ডে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, তোর বক্তব্য এই যে প্রথমে তাহারা মুখ্যত তোর উদ্দেশে তাহাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়া, দ্বিতীয়ত এবং গৌণভাবে আমার মন্দিরে আপন-আপন শিরশ্ছেদ করিয়াছে। এ তোর কি দুঃসহ দুর্বিনীত উক্তি! শ্রীদমন শিক্ষিত ব্যক্তি; তা প্রণয়বিদ্যায় তাহার আশানুরূপ অধিকার নাই-বা থাকিল। সে তো অর্বাচীনের ন্যায় আপনার কণ্ঠনালী কাটিয়া আত্মহত্যা করিতে যায় নাই। শাস্ত্র-সম্মতভাবে, বিধিমতে সে দেহ হইতে আপনার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল। ইহার জন্য যে প্রচণ্ড সাহস ও শক্তির প্রয়োজন তাহা সে পাইল

কোথা হইতে? এই শক্তিস্বরূপিণীই তাহাকে সেই অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। সুতরাং তোর বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাহাই হউক-না কেন, তোর কণ্ঠস্বরে যে অহমিকা রহিয়াছে তাহা অসহ্য! যেহেতু নানা মনোভাবের সংমিশ্রণে এই কর্ম সংঘটিত হইয়াছে এবং পরিষ্কাররূপে কারণ নির্দেশ সম্ভবপর নহে— তোর অনুমানের কিছুটা সত্য হইলেও হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, নিছক আমার করুণা লাভার্থ শ্রীদমন নিজেকে বিসর্জন দিতে আসে নাই, আসিয়াছিল তাহার অন্তরের যন্ত্রণায় এবং সে যন্ত্রণার কারণ তুই। বেচারা নন্দের আত্মদান শ্রীদমনের আত্মাহুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এক-একবার মনে হইতেছে আমার প্রতি মুখ্যত উদ্দিষ্ট না হইলেও তাহাদের এই পূজা গ্রহণ করি।···নাঃ, তাহাতে প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, সত্য করিয়া বল তো, আমি যদি এই দুই মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করি, যদি সব কিছু পূর্বের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা হইলে কি তুই ভবিষ্যতে সভ্যভব্য আচরণ করিতে পারিবি?'

উদ্‌গত অশ্রুধারা কোন প্রকারে নিবৃত্ত করিয়া সীতা বলিল:

'অহো মাতঃ! যদি তুমি ইহা করিতে পার, যদি এই অঘটন প্রত্যাহরণ করা সম্ভবপর হয়, যদি স্বামী ও বয়স্যকে প্রত্যর্পণ করিতে পার এবং পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পার— তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া তোমায় সাধুবাদ দিব। আর যাহাতে শ্রীদমনের প্রাণে যন্ত্রণা না হয়, তজ্জন্য আমি স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নে কথা কওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিব। যদি সব কিছু পূর্বের মত হয় তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি থাকিবে না, তোমার মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিলাম, প্রাণে গভীর আঘাত পাইয়াছি সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্পষ্ট বুঝিয়াছি ইহা ছাড়া আর অন্য কিছু ঘটিতে পারিত না। তথাপি, মাতঃ, তোমার যদি সেই শক্তি থাকে যে, তুমি যাহা ঘটিয়া গিয়াছে—তাহার গতি ফিরাইয়া তাহাকে নূতন পথে চালনা করিতে পার, তাহা হইলে সে এক মহা আশ্চর্য ব্যাপার হইবে!'

দৈববাণী বিরক্তির সুরে বলিল :

' 'যদি শক্তি থাকে, যদি করিতে পার' এই সকল সংশয়বাচক উক্তির অর্থ কি, বৎসে ? আমার যে মহিমা, তাহার নিকট ইহা তো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। একাধিক বার তো এই পৃথিবীতে আমার মহিমা আমি প্রকট করিয়াছি। এক্ষণে তোমার ও তোমার জঠরস্থ পাংশুবর্ণ অন্ধ অঙ্কুরটির প্রতি কী কারণে যেন আমার মনে করুণার উদয় হইতেছে। তুমি যে দয়ার পাত্রী নহ, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত, ওই যে আমার দুটি তরুণ সন্তান —তাহাদের কথা চিন্তা করিয়াও আমার মাতৃহৃদয় ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমি যাহা বলিতে চাহি সবিশেষ অবধান কর। তোমার ওই করধৃত লতাতন্তুর ফাঁস পরিত্যাগ কর। যাও আমার মন্দিরে, আমার বিগ্রহ ও তাহার সম্মুখে যে-বীভৎস কাণ্ড তোমার দোষে ঘটিয়াছে, একবার গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ কর। আর কিন্তু চক্ষুর জল ফেলা চলিবে না, সংজ্ঞা হারাইয়া অকর্মণ্য হওয়া চলিবে না। দুইটি মস্তকের কেশ আকর্ষণপূর্বক দেহদ্বয়ের নিকট লইয়া আইস। অতঃপর খর্পরের যে-দিকটা শাণিত, তাহা মাথা ও ধড়ের মধ্যস্থিত ফাঁকে রাখিয়া দুর্গা, কালীদেবী— কিংবা অপর কোনো নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিতে থাক, দেখিবে উহারা দুইজনেই বাঁচিয়া উঠিবে। কেমন, সব কথা ঠিক বুঝিলে কি ? সাবধান, ধড়ের নিকটে মাথা রাখিতে গিয়া মনে হইবে পরস্পর যেন পরস্পরকে আকষণ করিতেছে। যদি আগ্রহাতিশয়বশতঃ কাল-বিলম্ব না করিয়া জোড়া লাগাইতে যাও, তাহা হইলে যে রক্ত দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে, দেহ-অভ্যন্তরে তাহা পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য এই বিপরীত মুখবাহিকা শক্তি চক্ষের নিমিষে ইহার কর্ম করে। তথাপি ঐন্দ্রজালিক ঘটনা ঘটিতেও তো কিঞ্চিৎ সময় লাগে। আশা করি, আমার সমস্ত কথা মন দিয়া শুনিয়াছ। এবার দ্রুত প্রস্থান কর। কিন্তু দেখিও, কার্যটি যেন যথাযথ সম্পাদিত হয়। ব্যস্তসমস্ত হইয়া যদি বিপরীত

দিকে মস্তক যোগ করিয়া দাও, তাহা হইলে ইহারা আজীবন পিছনমুখী হইয়া হাঁটাচলা করিবে এবং জগৎশুদ্ধ লোক ইহাদের দেখিয়া হাসিঠাট্টা করিবে। যাও, যাও। কল্য অবধি যদি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে কিছুতেই কিছু হইবে না।'

॥ আট ॥

সুন্দরী সীতা আর একটি কথাও কহিল না। এমন-কি, দেবীকে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইতেও ভুলিয়া গেল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র দ্রুতধাবনের অনুকূল ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, সে ঊর্ধ্বশ্বাসে মন্দির অভিমুখে ছুটিল। সভামণ্ডপ, দেউল প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সে গর্ভগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে সেই ভয়ংকরী কালীমূর্তির সম্মুখে, সে ত্বরান্বিত উৎসাহে দেবীনির্দিষ্ট আদেশ পালনে তৎপর হইল। শিরের সহিত শরীরের যে তুর্নিবার আকর্ষণের কথা দেবী বলিয়াছিলেন, তেমন কিছু অনুভূত হইল না। আকর্ষণ একটা ছিল, তবে জোড়া লাগিবার পূর্ব পর্যন্ত সময়ও যথেষ্ট ছিল। সেই সময়ের মধ্যে বিপরীতমুখী রক্তের ধারা, ইন্দ্রজালবৎ শরীরের রক্তবহা ধমনীর মধ্যে কলকল শব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল। মন্ত্রপূত খড়্গ অব্যর্থভাবে আপন কাজ সম্পাদন করিল। তাহা ছাড়া দেবীর নামেরও তো গুণ আছে। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সীতা বার বার তিনবার বরদাত্রী দেবীর নাম উচ্চারণ করিল। যথাস্থানে মস্তক দেহের সহিত এমনভাবে যুক্ত হইল যে অস্ত্রাঘাতের সামান্য চিহ্নটুকুও পরিগোচর হইল না। তরুণদ্বয় পুনর্জীবন লাভ কবিয়া ভূমিশয্যা হইতে গাত্রো-খান করিল। একবার তাহারা সীতার দিকে চাহিল, পরমুহূর্তে আপন আপন শরীরের অধোদেশের দিকে। তাহারা আপন আপন শরীর দেখিতে গিয়া যাহা দেখিল তাহা পরস্পরের শরীর।

সীতা, ইহা তুমি কি করিলে? অথবা ইহা কি অঘটন ঘটিল? অথবা ত্বরান্বিত হইতে গিয়া কি ইহা তুমি ঘটাইলে? কার্য সম্পাদন অথবা ঘটনা ঘটাইবার মধ্যে যে সূক্ষ্ম সীমারেখা, তাহা মনে রাখিলে বলিতে হইবে— ইহা তোমার কিরূপে হইল? এই কার্য করিতে

গিয়া তোমার উত্তেজনার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু চোখের মাথা কি তুমি খাইয়া বসিয়াছিলে যে এরূপ ঘটিল ? তুমি তো সম্মুখভাগে না বসাইয়া মস্তকদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে বসাইতে যাও নাই ! সে বিষয়ে তুমি তো দিব্য প্রকৃতিস্থ ছিলে। কিন্তু অতি অদ্ভুত এই ঘটনা যদি নিতান্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনাই বল, ভুলই বল কিংবা জটিল পরিস্থিতিই বল— হয়তো এই তিনপ্রকার অনুমানই যথার্থ, প্রত্যক্ষ দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইল যে মন্ত্রপূত খড়্গের সাহায্যে তুমি একের মাথা অন্যের দেহে একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছ। নন্দের মাথা শ্রীদমনের সঙ্গে এবং শ্রীদমনের মাথা নন্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, উন্নত শীর্ষদেশ ব্যতিরেকে শ্রীদমনের দেহ শ্রীদমন কি না তাহা প্রশ্নের বিষয়। তেমনই বলা চলে, মস্তকবিহীন নন্দের দেহ প্রকৃতপক্ষে নন্দ কি না। মোট কথা এই যে, দুইটি পুরুষ মন্দিরতল হইতে উত্থিত হইয়া তোমার নিকট দণ্ডায়মান, ইহারা যথাক্রমে স্বামী ও সখা নহে, একত্র সখা ও স্বামী। নন্দের নিতান্ত সাদাসিধা মস্তক ধারণ করিয়া এই যে শ্রীদমনের বস্ত্র পরিহিত পীন উদর বিশিষ্ট দুর্বল দেহটি দাঁড়াইয়া আছে—এ-ব্যক্তি কি নন্দ ? অবার শ্রীদমনের শান্ত স্নিগ্ধ উন্নত মুখচ্ছবি ধারণ করিয়া ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ যে ব্যক্তিটিকে দেখিতেছ, যাহার কৃষ্ণবর্ণ কপাটবক্ষের সুকোমল রোমরাজির উপর মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে, যে-ব্যক্তি পীনজঙ্ঘ সুগঠিত পেশল পদদ্বয়ের উপর দৃঢ়-ভাবে দণ্ডায়মান, তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। ইহাকেই কি শ্রীদমন বলিবে ?

অবিলম্বে কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া, অধৈর্যবশত এ কী তুমি করিলে, সীতা ? যাহারা আপনাদের বলি দিয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঁচিয়া উঠিতে গিয়া তাহাদের দেহান্তর, রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। স্বামীর দেহ গিয়া যুক্ত হইয়াছে সখার মুণ্ডের সহিত, সখার দেহ স্বামীর মুণ্ডে। তাহাদের বিস্ময়বিস্ফারিত

চীৎকারে গুহা-অভ্যন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নন্দ-শিরধারী দুই হাতে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুভব করিতে লাগিল। ইহা সেই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দেহ যাহা শ্রীদমনের সুগঠিত শিরের গৌরব বহন করিত। অপর পক্ষে শ্রীদমন (উত্তমাঙ্গ যদি ব্যক্তির চরম পরিচয় হয়, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি শ্রীদমনের মস্তকধারী) লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেহসর্বস্ব নন্দের দেহকে আপনার দেহ বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্যদিকে তাহার নিজের স্কন্ধের উপরিস্থিত নন্দের সাদাসিধা মাথা তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। এই নূতন উদ্‌ভট যাহার কীর্তি, সেই সীতা একবার একজনের নিকটে গিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে, আবার অন্যজনের নিকটে গিয়া কাতর কণ্ঠে বিলাপ করিতে থাকে। একবার ইহাকে আলিঙ্গন করে, আরবার উহাকে। অবশেষে সে তাহাদের পদতলে মাথা কুটিয়া, হাসিকান্না বিমিশ্র কণ্ঠে স্বীকার করিল যে তাহার ভুল হইয়া গিয়াছে। বলিল :

'ক্ষমা করিতে পার যদি, তোমরা ক্ষমা করিও। প্রিয়তম শ্রীদমন, (এত বলিয়া সীতা শ্রীদমনের মস্তকধারী ব্যক্তির দিকে চাহিল। এই ব্যক্তির নন্দদেহের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিল না) ক্ষমা কর। তুমিও ক্ষমা কর নন্দ (এই ক্ষেত্রেও সীতা চাহিল উত্তমাঙ্গের প্রতি। যেন নন্দের সাদাসিধা মস্তকটাই মুখ্য এবং ইহার অধোদেশে সংলগ্ন অকিঞ্চিৎকর শ্রীদমনদেহের কোনো অস্তিত্বই নাই)। ভাবিয়া দেখ, কী ভয়ংকর কাণ্ড তোমরা (অর্থাৎ তখন তোমরা যেরূপ ছিলে) করিয়াছিলে, কিরূপ হতাশা ও দুঃখের কূপে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। মনে রাখিও, আমি উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। মনে রাখিও, ইহার অনতিবিলম্বে অশরীরী দুর্গাদেবীর বজ্রনির্ঘোষতুল্য আকাশবাণী আমার কর্ণগোচর হইল। আমার প্রায় সংজ্ঞা হারাইবার উপক্রম হইল। সুতরাং বুঝিতেই পার, তাঁহার প্রত্যাদেশ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিব— আমার এরূপ মনের অবস্থা

ছিল না। চক্ষুর সম্মুখে সকল কিছুই যেন ভাসা-ভাসা ভাবে ভাসিতে লাগিল। স্পষ্ট দেখি নাই কাহার মাথা কাহার ঘাড়ে গিয়া লাগিল। ভাবিয়াছিলাম, অদৃষ্টগুণে যোগ্যের সহিত যোগ্য যুক্ত হইবে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা ছিল আশানুরূপ ঘটিবে, পঞ্চাশভাগ ছিল ঘটিবে না। এক্ষণে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি। ঘাড়-মুণ্ড এক করিবার কালে মনে হইল পরস্পর পরস্পরকে স্পষ্টত আকর্ষণ করিতেছে। অন্যভাবে যুক্ত করিতে গেলে হয়তো আকর্ষণ অধিকতর হইত। কিন্তু আকর্ষণের পরিমাণ ঠিক কতখানি হইলে ঠিক হইত— তাহা কি করিয়া জানিব। আর দুর্গাদেবী যে একেবারে নির্দোষ তাহাই বা কিরূপে বলি। তিনি আমাকে কেবল একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন আমি মুণ্ডের সম্মুখভাগ পৃষ্ঠ-দেশের দিকে না লাগাই। সে বিষয়ে আমি কিন্তু যথোচিত সাবধান ছিলাম। এইরূপ যে ঘটিতে পারে, সে-সম্ভাবনা তো দেবীর মনেও উদিত হয় নাই। এখন সত্য করিয়া বলো, পুনর্জীবিত হইতে গিয়া যেভাবে পুনর্গঠিত হইলে, তাহার জন্য আমাকে কি আজীবন শাপান্ত করিবে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আদিদেবী যে-কার্য হইতে আমাকে নিরস্ত করিলেন সেই কার্য সমাপ্ত করি। আর একটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিলে আমাকে হয়তো মার্জনা করিতে পারিবে। এমনও হইতে পারে যে, অন্ধ নিয়তি-কর্তৃক যাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহাই হয়তো আমাদের সকলের পক্ষে নবজীবনের সূচনা করিবে। পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিলে যাহা হইতে পারিত, হয়তো এই নবজীবন তদপেক্ষা সুখের হইবে। পূর্বাবস্থা যে সুখের ছিল না, সে তো আমরা সকলেই সম্যক্ অবগত আছি। এখন, সবলদেহ শ্রীদমন ও দুর্বলদেহ নন্দ, তোমরা উভয়ে তোমাদের বক্তব্য বলো, আমি শ্রবণ করি।'

পুনর্গঠিত যুবকদ্বয় নতজানু হইয়া দুইজোড়া বাহুর সাহায্যে রোরুদ্যমানা সীতাকে ভূমিতল হইতে তুলিয়া লইল। তিনজনই পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া যুগপৎ হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিল।

একটি ব্যাপার সূচনাতেই স্পষ্ট বোধগম্য হইল— সীতা তাহার এই দুই ব্যক্তিকে মস্তক-অনুসারে সম্বোধিত করিয়া স্ত্রীবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইল। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের অহংবৃত্তি যে মস্তক-আশ্রিত, তাহার সত্ত সত্ত প্রমাণ মিলিল। গৌরবর্ণ ও অপ্রশস্ত স্কন্ধে আরূঢ় সহজ সরল নন্দের শ্যামবর্ণ মুণ্ড মনে করিল সে সত্যসত্যই গর্গপুত্র নন্দ। তেমনি শক্তসমর্থ শ্যামবর্ণ দেহের সহিত যুক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় গৌরবর্ণ মুণ্ড ভাবিল সে সত্যই শ্রীদমন। দ্বিতীয়ত, দেখা গেল সীতার ভুলের জন্য দুইজনের মধ্যে কেহই তাহার প্রতি রাগান্বিত নহে, বরঞ্চ মনে হইল নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবার ফলে দুইজনই আনন্দিত।

শ্রীদমন বলিল :

'নন্দের অদৃষ্টে যে-দেহ পড়িয়াছে তাহার বক্ষে রোমরাজি নাই বলিয়া যদি সে ক্ষুণ্ণ হয় তাহা হইলে আমিও ক্ষুণ্ণ হইব। কিন্তু এই নূতন দেহ লইয়া তাহার যদি কোনো অনুযোগ না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিব পৃথিবীতে আমা-অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি আর কেহ নাই। মনে মনে আমার সর্বদা আকাঙ্ক্ষা হইত যেন এই রকম একটি দেহ আমার হয়। আমার এই বাহুর মাংসপেশী যখন স্পর্শ করি, প্রশস্ত স্কন্ধের দিকে ও শক্ত সুগঠিত পদদ্বয়ের দিকে যখন তাকাই, আমার মনে এক অভূতপূর্ব পুলকের সঞ্চার হয়। আমি মনে মনে বলি, এখন হইতে আমি নব উদ্দীপনায় উচ্চশির হইয়া চলাফিরা করিতে পারিব। এই দেহের শক্তি ও সৌষ্ঠব লইয়া গর্বমিশ্রিত আনন্দ তো রহিয়াছেই, উপরন্তু এখন হইতে আমার আত্মিক গৌরব দৈহিক গৌরবের সমতুল্য হইবে। এক্ষণে আমি যদি আচার-অনুষ্ঠানাদি সরলীকরণের পক্ষে মত দিই, কিংবা যদি সহকারতরুচ্ছায়ে আহূত গ্রামসভায় উপস্থিত হইয়া বলি যে, ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞের পরিবর্তে জ্যোতির্ময় গিরিরাজের পূজার ছলে পর্বতসানুদেশে ধেনুসকলের শোভাযাত্রা হউক, তাহা হইলে আমার মতামত লইয়া লোকে আর

হাস্যপরিহাস করিতে পারিবে না। আমার এই নবলব্ধ দেহের সহিত এই-সকল প্রচলিত প্রথাবিরোধী মতামতের একটা আত্মীয়-সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনো-বেদনার কারণও বর্তমান। এতদিন আমার অনায়ত্ত ছিল বলিয়া যাহা আত্মস্থ করিবার উচ্চাশা পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা আমার করতলগত। যাহা বাহিরের ছিল, দূরের ছিল— আজ তাহা আপনার হইয়াছে, নিকটে আসিয়াছে—এই প্রাপ্তির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা রহিয়াছে। তবে আজ আমি আপনাতে আপনাকে লাভ করিয়াছি বলিয়া গৌরব বোধ করিতেছি। ইন্দ্র-যজ্ঞের স্থলে আজ আমি যদি বনভোজনের বিকল্প ব্যবস্থার সমর্থন করি, তবে তাহার কারণ হইবে এই যে, এখন আমার নিজস্ব মতামত আমি অসংকোচে ব্যক্ত করিতে পারিব, প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করিতে যাইব না। যাহা হইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইলাম। হওয়া শেষ হইল, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে আর কোনো ভেদ রহিল না— ইহাতে একটি বেদনার কারণ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা মানিতেই হইবে। কিন্তু সুন্দরী সীতা, তোমার কথা মনে হইলে এই সমস্ত ভাবনা বিদূরিত হয়। কারণ, আমার সমস্ত স্বার্থচিন্তা ও অহমিকার ঊর্ধ্বে তোমার স্থান। যখন মনে করি, এই নূতন দেহান্তর হইতে তুমি আনন্দ লাভ করিবে তখন আমার গর্ব ও সন্তোষের সীমা থাকে না। সুতরাং আমি সর্বান্তঃকরণে বলিতে পারি, যে দৈবী ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের কল্যাণের নিমিত্তই হইয়াছে, বলিতে পারি 'সিয়া' অর্থাৎ এইরূপই হউক!'

বন্ধুর কথা শুনিয়া নন্দ লজ্জায় অধোবদন হইয়া, বলিল:

'আহা, ব্যাকরণটুকু শুদ্ধ রাখিয়া 'সিয়াৎ' তো বলিতে পারিতে। তোমার দেখিতেছি চাষাড়ে দেহের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষাও অনুরূপ হইয়া গিয়াছে। ওই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুকাল আমার মস্তকের সহিত যুক্ত ছিল। পুরাতন জিনিসে আমার আর আগ্রহ নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে

আমার দেহখানা ব্যবহার করিতে পার। তোমার প্রতিও আমার কোনো ক্রোধ নাই, সীতা। এই অলৌকিক ঘটনার স্বপক্ষে আমিও বলি 'সিয়াৎ'—এইরূপই হউক। আমি এতকাল ঠিক এইপ্রকার একটি একহারা দেহের সন্ধানে ছিলাম। আজ যদি আমি আচার-অনুষ্ঠানাদি সরলীকরণের বিপক্ষে মত দিই এবং ইন্দ্রপূজার জন্য যাগ-যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তাহা হইলে আমার মতামতের সহিত আমার সাদাসিধা প্রাকৃতজনোচিত মস্তকের অসংগতি থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু নবলব্ধ এই পণ্ডিতজনোচিত কলেবরের সহিত এই-সকল রক্ষণশীল মতামত দিব্য মানাইবে। তোমার নিকট দেহ এক্ষণে যতই গৌণ হউক-না কেন শ্রীদমন, আমার নিকট এক্ষণে দেহই মুখ্য, শীর্ষদেশ গৌণ। আর সীতা, তুমি যৎকালে ধড়ের সহিত মুণ্ড সংযুক্ত করিতে গিয়া দেখিলে, একের মুণ্ড অন্যের ধড়ের প্রতি একান্ত-ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, তখন এই কথাই প্রমাণিত হইল যে আমরা দুই সখা অবিচ্ছেদ্য। আশা করি যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো বিভেদবিচ্ছেদ ঘটিবে না। কিন্তু একটি কথা অবশ্য বলিব— আমার মস্তক যতই ক্ষীণবুদ্ধি হউক-না কেন, আমার অদৃষ্টলব্ধ এই শরীরটার ন্যায্য অধিকার-বিষয়ে এ-মস্তক অতিমাত্রায় সচেতন। সুতরাং শ্রীদমনের কয়েকটি মন্তব্যে আমি সবিশেষ আশ্চর্যান্বিত ও আশঙ্কিত হইয়াছি। তাহার মন্তব্য হইতে মনে হইল সে যেন সীতার ভবিষ্যৎ স্থিরনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমার তো মনে হয় এরূপ স্থির সিদ্ধান্তের কোনো হেতু নাই। একটি চরম প্রশ্ন আমাদের সম্মুখীন ; আমার মাথা তাহার যে সমাধান স্থির করিয়াছে, তোমার মাথা মনে হইতেছে তাহার বিপরীত কিছু বলিতে চাহে।'

সীতা ও শ্রীদমন একযোগে জিজ্ঞাসা করিল :

'সে কেমন ?'

ক্ষীণতনু বয়স্য তাহাদের এই প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল :

'কেমন? ইহা কি জিজ্ঞাসার যোগ্য প্রশ্ন হইল? বলিয়াছি তো আমার নিকট দেহ হইল মুখ্য। বিবাহ অনুষ্ঠানেও দেখিবে যে বিবাহের নিগূঢ়ার্থ হইল সন্তান উৎপাদন, এবং ইহা তো সকলেই জানে এই প্রজননকর্ম সম্পন্ন করিতে হইলে দেহের দরকার। মাথা খাটাইয়া তো পিতা হওয়া যায় না। সীতা তাহার গর্ভে যে সন্তান-ধারণ করিয়াছে আমি যে তাহার পিতা, এই সত্য অস্বীকার করে এমন সাধ্য কাহার, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।'

আপনার অজ্ঞাতে শ্রীদমনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা উষ্মার ভাব আভাসে দেখা দিল। সে বলিল, 'নন্দ, তোমার কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল? এ-সব কী কথা বলিতেছ তুমি? তুমি নন্দ না আর কেহ?'

অপর জনে উত্তরে বলিল, 'আমি নন্দ বটে। কিন্তু যন্মুহূর্তে এই পরিণীত দেহটাকে 'আমার' বলিয়া উল্লেখ করি, তদ্দণ্ডে নিতম্বিনী সীতা আমার পরিণীতা বধূ এবং তাহার গর্ভস্থ সন্তান আমার এই দেহের ঔরসজাত বলিয়া নিশ্চিত বুঝিতে পারি।'

কম্পিতকণ্ঠে শ্রীদমন বলিল :

'বটে? সেইরূপ ভাবিতেছ বুঝি? আমি হইলে তোমার ন্যায় জোর গলায় এই সব কথা বলিতে সাহস পাইতাম না। তোমার বুঝা উচিত, বর্তমানে যাহা হইল তোমার দেহ, তাহা সীতার পার্শ্বে যখন শয়ন করিত তখন সে দেহ ছিল আমার—তোমার নহে। স্বপ্নের ঘোরে সে যখন ওই দেহখানা জড়াইয়া ধরিত, তখন তাহার প্রলাপোক্তি হইতে বুঝিতে পারিতাম তাহার সত্যকার কাম্য হইল সেই দেহ, যাহা কি না আমি এক্ষণে ধারণ করিয়া আছি। এই সকল লজ্জাকর ঘটনার অবতারণা করিলে আমাকেও দু-এক কথা বলিতে হয়। কিন্তু উহা আমার নিকট রুচিকর নহে। নিতান্ত মাথা খারাপ না হইলে তোমার ওই মাথা এবং ওই শরীর লইয়া তুমি এই-ভাবে আস্ফালন করিতে না, বলিতে না আমি এবার তুমি হইলাম

এবং তুমি এবার আমি হইলে। ওই প্রকার পরিবর্তন যদি সত্যই ঘটিত, তুমি যদি সীতার স্বামী শ্রীদমন হইতে ও আমি নন্দ হইতাম— তাহা হইলে তো সত্যকার পরিবর্তন কিছু ঘটিত না। যথাপূর্বম্ তথা পরম্ হইত। এই যে আশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল তাহার মধ্যে আনন্দজনক যদি কিছু থাকে তো তাহা এই যে, সীতার হস্তে আমাদের মুণ্ডের বদলে মুণ্ড ও ধড়ের বদলে ধড় লাভ হইল। যেহেতু মুণ্ড হইল শরীরের শীর্ষদেশ, সেইজন্য মুণ্ডে এই আনন্দচিন্তা জাগিতেছে যে, এই পরিবর্তনের ফলে যে সকলের অধিক আনন্দ লাভ করিবে সে হইল শোভন-শ্রোণীযুতা সীতা। কোথায় তাহার আনন্দ লইয়া আমরাও আনন্দ করিব, না তুমি নিতান্ত কলহপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া বসিলে তোমার ওই পরিণীত দেহটাই স্বামীর এবং আমার এ দেহ হইল বয়স্যের। এই স্বার্থপরতার জন্য তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত, কারণ সীতার সুখের চেয়ে তোমার এই শরীরের সুখটাই তুমি বৃহত্তর করিয়া দেখিলে।'

নন্দের কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ তিক্ততার সঞ্চার হইল। সে বলিল:

'সীতার যে সব সুখ-সুবিধার কথা তুমি উত্থাপন করিলে তাহা তো ওই দেহ হইতে, যাহা এক্ষণে তুমি তোমার নিজস্ব মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছ। সত্য বলিতে কি, তুমি আমা অপেক্ষা কম আত্মম্ভরী নহ। উপরন্তু, তুমি ইচ্ছাপূর্বক আমাকে ভুল বুঝিতে চাহিতেছ। আমি যাহা বলিতেছি তাহা এই পরিণীত দেহের সূত্র ধরিয়া বলিতেছি— ইহা কিরূপে তোমার মনে হইল? এই নাতিপুষ্ট নব কলেবরের শীর্ষে যে-মস্তকখানি দেখিতেছ, যাহা নাকি আমার নন্দের নন্দত্ব প্রমাণ করিতেছে, সেই মাথার দিব্য দিয়া আমি বলিতে পারি—সীতার মঙ্গলচিন্তায় আমার আগ্রহ তোমা-অপেক্ষা অনধিক নহে। সম্প্রতি সীতা যখন আমার দিকে চাহিত ও সুমধুর কলকণ্ঠে আমাকে সম্ভাষণ করিত, আমার হৃদয়ে যুগপৎ ত্রাস ও আনন্দের সঞ্চার হইত। আমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া, আমার মুখের

পানে উন্মুখ হইয়া সে যখন আমার অন্তরের গোপন কথা বুঝিবার প্রয়াস পাইত, কিংবা নাম ধরিয়া আমাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিত, আমার ভয় হইত পাছে আমার কণ্ঠেও মধুর আবেগের সঞ্চার হয়। তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার তেমন প্রয়োজনও হয় নাই—কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সীতার এই আচরণে একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল। এখন মনে হইতেছে, সীতার কাম্য বস্তু ছিল আমার দেহ নহে, আমার হৃদয়। আর এই দেহের কী-ই বা মূল্য? তুমি স্বয়ং তো সপ্রমাণ করিলে যে সেই দেহ ধারণ করিয়াও তুমি এখনও শ্রীদমন রহিয়া গেলে। সেই সময়ে আমি কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে সীতার সহিত কথা বলি নাই, পাছে প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি। তোমার সখ্যের খাতিরে ও বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ, আমি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকি নাই, তাহার প্রতি চোখ তুলিয়া চাহি নাই— পাছে আমার চোখের আকূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমার ভাগ্যে কী পড়িয়াছে দেখা যাউক। প্রথমত, সীতার সেই প্রিয়-সম্ভাষিত বদনমণ্ডলযুক্ত শীর্ষদেশ এবং দ্বিতীয়ত, তদতিরিক্ত এই শুভপরিণয়যুক্ত পতিদেহ। পূর্বপরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন যাহা ঘটিয়াছে সেই সুফলের অধিকারী সীতা ও আমি উভয়ে। বিশেষত সীতার পক্ষে তো এই সুযোগের তুলনা হয় না। যদি তাহার সুখ ও তৃপ্তি আমরা সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাদের সকল সমস্যার এরূপ সর্ব-দোষমুক্ত সর্বার্থসাধক সমাধান সন্ধান করিয়া পাওয়া দুষ্কর।'

শ্রীদমন বলিল:

'তুমি এরূপ ব্যবহার করিবে—ইহা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আমার আশঙ্কা ছিল আমার দেহ লইয়া তুমি হয়তো কুণ্ঠা অনুভব করিবে। এক্ষণে অর্বাচীনের ন্যায় তুমি শির ও শরীর লইয়া কত যে পরস্পরবিরোধী কথা বলিতেছ। কখনও বলিতেছ বিবাহব্যাপারে মস্তক শ্রেষ্ঠ, কখনও-বা বলিতেছ দেহ শ্রেষ্ঠ মস্তক গৌণ। এত দিন

তোমাকে শান্ত শিষ্ট বিনীত স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া জানিতাম। অকস্মাৎ দেখিতেছি তোমার স্পর্ধা চরমে উঠিয়াছে। তুমি কিনা বলিয়া বসিলে তোমারই মধ্যে সীতার সুখ ও তৃপ্তি সাধনের সর্বদোষমুক্ত সর্বার্থসাধক সমাধান রহিয়াছে। অথচ ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ যে আমার নিকট সীতার পরম আনন্দের চরম চাবিকাঠি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে অধিক বাগবিতণ্ডা করিয়া কি লাভ? সীতা স্বয়ং এই স্থানে উপস্থিত। আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার অঙ্কশায়িনী হইলে তাহার সর্বাধিক সুখ— এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি সে নিজেই করুক।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সীতা একবার ইহার দিকে আর বার উহার দিকে চাহিয়া রহিল। অতঃপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বলিল:

'বিচার নিষ্পত্তি আমি কিরূপে করিব? আমার উপর জোর করিও না, আমি সামান্য নারী মাত্র। প্রথম প্রথম সমস্তই সহজ মনে হইয়াছিল। আমার ভুলের জন্য প্রথমে লজ্জা বোধ করিয়াছিলাম সত্য। কিন্তু যখন দেখিলাম পরিবর্তনের ফলে তোমরা উভয়েই সুখী হইয়াছ, আমারও আনন্দ বোধ হইল। কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা শুনিয়া আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত, আমার হৃদয় সংশয়-সমাচ্ছন্ন। আমি এখন ভারি দোটানার মধ্যে পড়িয়াছি— হাঁ ও না-এর মধ্যে মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। তোমাদের এই পরস্পরবিরোধিতা আমার চিত্তেও পরস্পরবিরোধী ভাবের সঞ্চার করিয়াছে। প্রিয়তম শ্রীদমন, তুমি যাহা বলিলে তাহার অনেকখানি সত্য, ইহা অবিসংবাদিত আমি যে-স্বামীর ঘরসংসার করিব তাহার মুখাকৃতি তোমার অনুরূপ হইতে হইবে। যখন মনে করি, মুণ্ডবিহীন নন্দের দেহখানা কিরূপ অকিঞ্চিৎকর দেখাইতেছিল, তখন নন্দের প্রতিও আমার মায়া হয়। একটি বিষয়ে আমি তাহার সহিত একমত— যখন নন্দ-নামে তাহাকে প্রিয়-সম্বোধন করিতাম, তখন খুবসম্ভব তাহার বদনমণ্ডলই ছিল আমার আগ্রহের বিষয়— তাহার দেহ নহে। আর শ্রীদমন, তুমি যে বলিলে

'পরম আনন্দের চরম চাবিকাঠি'— আমার স্বামীর শির না দেহ আমাকে পরম আনন্দ দান করিবে সেবিষয়ে আমি এখনও স্থির-নিশ্চিত নহি। আমাকে কষ্ট দিও না। এই সমস্যা সমাধান করি আমার এরূপ শক্তি নাই, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে যে আমার প্রকৃত স্বামী তাহা আমি বিচার করিতে পারিব না।'

কিয়ৎক্ষণের নিস্তব্ধতার পর নন্দ বলিল :

'সীতা আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে স্বামীরূপে নির্বাচন করিতে যদি দ্বিধা বোধ করে, তাহা হইলে কোনো তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তিকে বিচারের ভার লইতে হয়। এই যে সীতা বলিল শ্রীদমনের মুখাকৃতি যদি না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্বামীর ঘরসংসার সে করিতে পারিবে না, তখন আমার মনে কিপ্রকার চিন্তার উদয় হইয়াছিল, জান ? সীতা যদি আমাকে স্বামীরূপে পাইলে নিশ্চিন্ত হয় তাহা হইলে আমরা আর ঘরসংসার করিব না, লোকালয়ের বাহিরে নির্জনে কোথাও জীবন যাপন করিব। বনবাসে একান্তে থাকিবার বাসনা আমার বহুকালের। সীতার কোমল মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে আমার যখন ভাববৈকল্য ঘটিত, বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ হইত, তখন প্রায়ই ভাবিয়াছি সংসার ত্যাগ করিলে বেশ হয়। কামদমন নামে একজন কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইয়া, বৈরাগ্য বিষয়ে কিছু শিক্ষা লাভেরও প্রযত্ন করিয়াছি। দন্ডকারণ্যে এই সন্ন্যাসী অবস্থান করেন, সেখানে আরও বহুতর সাধুসন্ন্যাসী থাকেন। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গুহ। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ইনি কামদমন নাম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি ওই নামেই পরিচিত। স্নান-তর্পণ-বাক-সংযমাদি বিষয়ে ইঁহার কঠোর নিষ্ঠা ; মনে হয়, অনতিকাল পূর্বেই ইনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন। এই জীবনবেদজ্ঞ ইন্দ্রিয়বিজয়ী মহাজ্ঞানীর সন্নিকটে গিয়া আমাদের বক্তব্য নিবেদন করি। তোমাদের যদি সম্মতি থাকে, তাহা হইলে ইনি সকল প্রশ্ন বিচারপূর্বক আমাদের

বিধান দিয়া বলিবেন কীসে সীতার সুখ এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাহার স্বামী। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যেন আমরা নির্বিচারে মানিয়া লই।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সীতা কহিল :

'নন্দ যথার্থ বলিয়াছে। তবে তাহাই হউক। চল, আমরা এই সাধুর সন্নিধানে যাই।'

শ্রীদমন বলিল :

'আমি যতদূর বুঝিতে পারি, আমাদের উপস্থিত সমস্যা নিতান্তই বহির্জাগতিক। মনোজগতের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বাস্তব জ্ঞান যাঁহার আছে এইরূপ একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বিচার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।'

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে তাহারা দেবীমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিরিবর্ত্মবর্তী তাহাদের রথে আরোহণ করিল। এক্ষণে প্রশ্ন জাগিল বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে কে রথ চালনা করিবে, কারণ রথচালকের শরীরে যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, তদ্রূপ প্রয়োজন গন্তব্যপথ সম্বন্ধে জ্ঞান। দণ্ডকারণ্য দেবীমন্দির হইতে দুই দিনের রাস্তা। নন্দ সেই পথসম্বন্ধে বিলক্ষণ অবগত আছে সত্য, কিন্তু এক্ষণে সারথির বল্গা ধারণ করিবার ন্যায় বাহুবল তাহার আর নাই। অতএব শ্রীদমন বসিল চালকের আসনে এবং নন্দ তাহার পশ্চাতে সীতার পার্শ্বে গিয়া বসিল ও প্রয়োজনমত পথনির্দেশ করিতে লাগিল।

যাত্রারম্ভের পর তৃতীয় দিনে তাহারা দণ্ডকারণ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বর্ষাসমাগমে লতাগুল্ম ওষধি-বনস্পতি শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছে। এই তপোবনে বহু সাধুসন্ন্যাসীর বাস। অরণ্যের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে তাহারা প্রতিবেশী হইতে দূরে অবস্থান করতঃ আপন আপন নির্জন কুটিরে তপশ্চর্যায় রত। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেক হইতে পৃথক। এই-সকল নিভৃতাচারীর কুটির হইতে কুটিরে যাত্রীগণ কামদমনের নিবাসস্থান কোথায় সন্ধান করিতে লাগিল। এই-সকল

সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল, ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলেন, প্রত্যেকেই স্থিরনিশ্চয় যে তাঁহারা এই অরণ্যে নিঃসঙ্গ নির্জনে সাধনভজনে নিরত আছেন। সাধুদের মধ্যে নানা স্তরের সাধক রহিয়াছেন। কেহ কেহ গার্হস্থ্যাশ্রম অতিক্রম করিয়া, কখনও সস্ত্রীক কখনও-বা একাকী বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক অবশিষ্ট জীবন অল্পবিস্তর ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেছেন। কেহ কেহ বা যোগী, কেহ স্থূলমার্গে, কেহ-বা সূক্ষ্মমার্গে বিচরণশীল। ইঁহারা মন্ত্র তন্ত্র ব্রত কৃচ্ছ্র সাধনে তৎপর। সংযমের বল্গা ধারণ করিয়া ইঁহারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে নিরন্তর দমন করিতেছেন।

রিপুসকলকে ইঁহারা নিবৃত্তিরূপ তরবারির দ্বারা নিরন্তর আঘাত করিতেছেন। বিঘ্নসংকুল ও ভীতিপ্রদ আচার-অনুষ্ঠানাদি হইতেও ইঁহারা বিরত হয়েন না। প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিতে ইঁহাদের কুণ্ঠা নাই। প্রচুর বারিবর্ষণ সত্ত্বেও ইঁহারা গৃহের বাহিরে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। প্রচণ্ড শীতে ইঁহারা সিক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। আবার প্রখর গ্রীষ্মে আপনাদের কামাগ্নি আহুতি দিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা চতুর্দিকে অগ্নি-কুণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে আসন গ্রহণ করেন। শরীরের স্বেদনির্গমনের সহিত ইহাদের বাসনা কামনা অজস্রধারে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। ইঁহাদের উৎকট সাধনপদ্ধতির আর একটি প্রক্রিয়া হইল দিবাভাগে কখনও-বা ধূলির মধ্যে গড়াগড়ি দেওয়া, কখনও-বা পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকা, আবার কখনও ক্রমান্বয়ে উঠাবসার দ্বারা অবিশ্রাম অঙ্গচালনা। এইরূপ আত্ম-পীড়নের ফলে ইঁহাদের যদি স্বাস্থ্যহানি হয় কিংবা স্বর্গলাভের সময় আসন্ন হয়, তাহা হইলে ইঁহারা উত্তরে কিংবা পূর্বদিকে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। এই অন্তিমযাত্রার সময়ে ইঁহারা ঔষধপথ্যের অপেক্ষা রাখেন না, তখন ইঁহাদের একমাত্র সম্বল হয় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু ও তৃষ্ণার জল। অবশেষে যথাকালে ইঁহাদের নিষ্প্রাণ দেহ

চিরনিদ্রায় অভিভূত হয় এবং দেহবিমুক্ত আত্মা ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়।

আমাদের এই কাহিনীর জিজ্ঞাসুত্রয় অরণ্যের প্রান্তে অবস্থিত একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর নিকট তাহাদের রথ গচ্ছিত রাখিয়া তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অতঃপর, নির্জন ধ্যান-ধারণায় রত একাধিক সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল। অরণ্যের নিভৃততম প্রদেশে কামদমন অবস্থান করেন। সে স্থান প্রায় সন্ধানের অগম্য। নন্দ একবার অবশ্য পথহীন অরণ্যপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কামদমনের সাক্ষাতে আসিয়াছিল। কিন্তু তখন সে যে-দেহ ধারণ করিত, আজ তাহা শ্রীদমনের। সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে পথ চিনিবার যে-সহজাত প্রবৃত্তি তাহার ছিল, তাহা আজ অন্তর্হিত। পর্বতগুহা ও বৃক্ষকোটরে যে-সকল সাধু সন্ন্যাসীর বাস, তাঁহারা তো এমন ভাব দেখাইলেন যেন কামদমনকে তাঁহারা কস্মিনকালেও চিনেন না। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্বাশ্রমে গৃহস্থ ছিলেন এবং এক্ষণে সস্ত্রীক ধর্মজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, ইঁহাদের সহৃদয় ধর্মপত্নীগণ নিজ নিজ পতিদেবতার অগোচরে আগন্তুকদের পথের নির্দেশ দিলেন। আরও এক দিন এক রাত্রি বনে জঙ্গলে অতিবাহিত হইল। অতঃপর তাহারা তাহাদের গম্যস্থলে গিয়া পৌঁছিল। এই স্থান হইল কামদমনের রাজ্য। পৌঁছিবামাত্র তাহারা দেখিল সন্ন্যাসী আকণ্ঠনিমজ্জিত অবস্থায় একটি জলাশয়ে তপস্যায় রত রহিয়াছেন। দেখা গেল তাঁহার জটাজুট-লম্বিত পলিত কেশ ও শুষ্ক তরুশাখার ন্যায় তাঁহার দুই ঊর্ধ্ববাহু। কত ক্ষণ যে তিনি এই অবস্থায় দণ্ডায়মান আছেন— তাহা অনুমানের বিষয়। তাঁহার তপস্যায় একাগ্রতা দেখিয়া, আগন্তুকত্রয় নীরবে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ধ্যানভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে ডাকিবার সাহস করিল না। এদিকে তো তাঁহার তপোভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মনে হইল ইহারা তাঁহার লক্ষ্যগোচর হয় নাই, অথবা

লক্ষ্যগোচর হইয়াছে বলিয়াই হয়তো ইহাদের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। প্রায় প্রহরার্ধ কাল ইহারা জলাশয়ের অদূরে একান্তে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ন্যাসী ঠাকুর জলাশয় ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিলেন—জটায়, শ্মশ্রুতে, স্নাত দেহে জলাশয়ের পঙ্ক লাগিয়া আছে। পরিধেয়ের বালাই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর, মেদ-মাংস নাই বলিলেই হয়, একেবারে অস্থিচর্ম-সার দেহ। যে-দেহে শারীর পদার্থই নাই, সেই দেহের আবার লজ্জা কি। জলাশয়ের তীরে উঠিয়া সন্ন্যাসী তৎস্থলে রক্ষিত একটি সম্মার্জনী তুলিয়া লইলেন। পদক্ষেপ করিতে গিয়া পাছে ভূমিতলে বিচরণশীল কোন কীটপতঙ্গের প্রাণ হানি হয়, তজ্জন্য সম্মার্জনী সহকারে পথ পরিষ্করণের ব্যবস্থা। ক্ষুদ্রপ্রাণ কীটপতঙ্গের উপর এত যাঁহার মায়া, সমাগত আগন্তুকদের প্রতি তাঁহার তেমন কোন করুণা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ ইহাদের দেখিয়া রাগত ভাবে ইনি সম্মার্জনী তুলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তদবসরে যে কীটপতঙ্গের প্রাণহানি ঘটিতে পারে—এবং সেই প্রাণিহত্যার পাপ যে ইহাদের স্পর্শ করিতে পারে— সেদিকে সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

তর্জন গর্জন-সহযোগে কামদমন বলিল :

'দূর হইয়া যা আলস্যবিলাসীর দল! হাঁ করিয়া কি দেখিতেছিস? এই জনহীন অরণ্যে আসিয়াছিস কি উদ্দেশ্যে?'

নন্দ সবিনয় নিবেদন সহকারে বলিল :

'আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন বিধায় আপনার সমীপে আসিবার দুঃসাহস করিয়াছি। আমাদের মার্জনা করুন, হে কামজয়ী কামদমন! সংসারী জীব আমরা, কামরিপু জর্জরিত আমাদের জীবন। আপনি ষড়্‌রিপু দমন করতঃ কামদমন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আপনার যশকীর্তির কথা শ্রবণ করিয়া আমরা আপনার দ্বারস্থ। প্রজ্ঞাবান্ সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আপনি সিংহসদৃশ; আপনার উপদেশ-নির্দেশ দানে আমাদের সংশয় নিরসন করুন। কৃপা করিয়া আমার প্রতি

দৃষ্টিদান করিলে হয় তো আমাকে চিনিতে পারিবেন। ইতিপূর্বে একবার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে কি না— এবিষয়ে আপনার বিধান লইতে আসিয়াছিলাম।'

কামদমনের কোটরগত চক্ষুর উপরে খড়ের চালের মত রোমশ ভ্রূ নামিয়াছে। নন্দের দিকে দৃষ্টি হানিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন :

'হাঁ, মুখখানা চিনা চিনা মনে হইতেছে। কিন্তু দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে ইতিমধ্যে এমন কিছু একটা প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকিবে যাহার ফলে মেদ-মাংসের আতিশয্য ঘুচিয়া গিয়াছে, দেহ সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত হইয়াছে। বোধ করি গতবার এখানে আসিবার ফলে ইহা ঘটিয়া থাকিবে।'

নন্দ সোজা তাঁহার কথার জবাব না দিয়া বলিল ঃ

'হাঁ, উপকার পাইয়াছি যথেষ্ট— সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মধ্যে যে-পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করিতেছেন তাহার কারণ অন্য। সে এক অতি আশ্চর্য ও চিত্তচাঞ্চল্যকর কাহিনী। আমরা তিন জন তো সেই কাহিনী লইয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন, যাহার সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আপনি সমস্ত বিচার করিয়া আপনার সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন—সেই আশায় আপনার নিকট আসা। আপনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং এই কাহিনী শ্রবণে আপনার ভাববৈকল্য ঘটিবে না বলিয়া মনে হয়।'

কামদমন বলিলেন :

'ভাববৈকল্য ঘটিবে এমন কথা কে বলিল? শুনিব আমি তোমাদের কাহিনী। সূচনায় অবশ্য ইচ্ছা হইয়াছিল অর্ধচন্দ্র দিয়া আমার এই তল্লাট হইতে তোমাদের বহিষ্কৃত করি। কিন্তু এই প্রকার রাগ ও বিরক্তিও তো এক প্রকারের মোহ। আমি সেই মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিলাম। মনুষ্য সংসর্গ বর্জন করা যদি এক প্রকারের ত্যাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সংসর্গ স্বীকার করিয়া লওয়া

অধিকতর ত্যাগ স্বীকার। অবশ্য এ কথা সত্য তোমাদের সান্নিধ্য ও প্রাণশক্তির যে-উত্তাপ তোমাদের দেহ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহা আমার বক্ষে বেদনার ন্যায় বাজিতেছে। ভস্ম দ্বারা প্রলিপ্ত আছে বলিয়া তোমরা দেখিতে পাইতেছ না আমার গণ্ডদেশ কিরূপ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি সব কিছু সহ্য করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি যে তোমাদের মধ্যে একজন উদ্ভিন্নযৌবনা রমণী রহিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সম্ভোগের দৃষ্টিতে এই নারী অতুলনীয়া। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় ইহার তনু, কোমল ইহার জঙ্ঘা, পীনোন্নত ইহার কুচযুগ। হায় হায় এ কি বলিতেছি, ছিঃ ছিঃ। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে ইহার নাভিদেশ সুন্দর, খঞ্জননয়ন সংবলিত ইহার বদনমণ্ডল সুন্দর। আর ইহার পয়োধর? এমন পীনোন্নত পয়োধর সচরাচর কি দৃষ্টি-গোচর হয়? তোমাকে নন্দিত করি, হে সুন্দরী। এমন পুরুষ কি কেহ আছে, তোমাকে দেখিবামাত্র যাহার কামলিপ্সা রোমাঞ্চিত না হয়? এই যে তোমাদের ত্রয়ীসমস্যা, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয় রহিয়াছে তোমার ওই অতুলনীয় রূপলাবণ্যের মায়াজাল। তুমি এই স্থানে স্বাগত। এই তরুণদ্বয়কে আমি ঝটিতি বিতাড়ন করিতাম— যদি তুমি ইহাদের সহিত না থাকিতে। কিন্তু সুন্দরী, আসিয়াছ যখন যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া যাও। আমার বৃক্ষকোটরবর্তী নিবাসে তুমি অবস্থান করিবে। সুমধুর জম্বুফল আহরণ করিয়া পত্রপুটে রাখিয়াছি, তুমি তাহা মনের আনন্দে ভক্ষণ করিবে। জম্বুফল আহরণ করি কেন বলিব? আহার করিবার জন্য নহে, পরিহার করিবার জন্য। ওই রসাক্ত ফল চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া আমি কেবল রসহীন কন্দ ও মূল চর্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। রক্ত-মাংসের এই দেহটাকে মাঝে মাঝে আহার না দিলেই নহে— সেইজন্য এই ব্যবস্থা। তোমার দেহনিঃসৃত অগ্নিবাষ্পে যদি আমার নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়, তথাপি আমি তোমার কাহিনী আদ্যন্ত শুনিব— তোমার প্রত্যেকটি কথা।

কেহ যেন না বলিতে পারে কামদমন ভীরু কাপুরুষ। সত্য বলিতে কি, এ-ক্ষেত্রে সাহসে কৌতূহলে সামান্যই প্রভেদ। তোমার কথা শুনিতে আমার এরূপ আগ্রহ কেন, জান? এই নীরব নির্জনতায় শ্রবণেন্দ্রিয় সম্ভবতঃ তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণশক্তির মাদকতাময় বাষ্প আঘ্রাণ করিবার জন্য নাসারন্ধ্র সম্ভবতঃ ব্যাকুল হইয়াছে। যাহা হউক এই-সকল চিন্তা পরিহার করিলেই ভাল। যদি মনে কর ঔৎসুক্য-দমনের জন্য এই সংযম, তাহা হইলে মনের মধ্যে যে-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়, তাহার আশু মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। কৌতূহলই যদি নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে আমার পুরুষকারের কি অর্থ? ইহা আমার সেই জম্বুফলের মত। এই যে রসনার তৃপ্তিকর ফল আমি আমার হাতের কাছে রাখিয়া দিয়াছি, ইহার অর্থ হয়তো এই যে, আমি লোভ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি নাই। রসনার সাহায্যে ইহার রস গ্রহণ না করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা ইহাকে সম্ভোগ করিতেছি। মনে যখন আমার এইরূপ সংশয় জাগে, তখন আমি মনে মনে বলি যে, রসাল জম্বুফল দেখা মানে উহা ভোগ করিতে প্রলুব্ধ হওয়া। যদি প্রলোভনের বস্তু আয়ত্তগম্য থাকা সত্ত্বেও লোভ জয় করিতে পারি, তবেই তো আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সার্থক। অন্যথায় এই সন্ন্যাসী জীবনের কঠোরতা কোথায় রহিল? এখন যদি বল আমার এত কথা বলার অর্থ এই যে, আমি নিজে যাহা সম্ভোগ করিতে পারি না, অপরে যদি তাহা আমার সম্মুখে সম্ভোগ করে, তবে আমি বিকল্পে আনন্দ লাভ করি— তবে সেই সন্দেহ নিরর্থক হইবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, তোমার জম্বুফল ভক্ষণ আমার পক্ষে আনন্দকর হইবে। ইহার কারণ এই যে, তুমি, আমি ও আমরা সকলে সৃষ্টিলীলার বিচিত্র প্রকাশ। বাহিরের পার্থক্য যাহাই হউক-না কেন, মূলতঃ আমার তোমার ব্যক্তিসত্তা এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং, তোমার ভোগ একরূপ আমারই ভোগ। সত্য বলিতে কি, সন্ন্যাসগ্রহণ অর্থে আমি বুঝি সংশয়ের কূপে

আত্মবিসর্জন। এই অন্ধকূপের তল নাই, কারণ এই অবস্থায় প্রলোভন দুই দিক হইতে আক্রমণ করে— দেহের দিক হইতে যেমন, তেমন চিত্তের দিক হইতে। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, একমুখো সাপের মাথা কাটিলে তাহা দুইমুখো সাপে পরিণত হয়। সে যাহাই হউক, সব ঠিক থাকে যদি মনে সাহস থাকে। সুতরাং, হে সংসারী জীবসকল, যদিও তোমাদের চতুঃস্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল প্রাণ শক্তির তপ্ত নিঃশ্বাসে সমীরিত, তোমরা নিঃসংকোচে বৃক্ষকোটরবর্তী আমার আলয়ে প্রবেশ করো। পাপপঙ্কিল সংসার যাত্রার বিচিত্র কাহিনী আমার নিকট সবিস্তারে বর্ণন কর। কেবল মদীয় চিত্ত শোধনের নিমিত্ত নহে, পরন্তু আমি যে কেবল আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে উৎসুক নহি— সেই সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আমি তোমাদের সকল কথা ধৈর্য ধরিয়া অবধান করিব।'

অতঃপর সন্ন্যাসী ইহাদের পথ দেখাইয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিলেন। পদক্ষেপের পূর্বে সম্মার্জনী সহযোগে সম্মুখভাগের ভূমিখণ্ড পরিষ্করণ চলিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সন্ন্যাসীর আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি বৃদ্ধ, অতি পুরাতন, অতি প্রকাণ্ড একটি কদম্ব বৃক্ষ; ইহার শীর্ষদেশে হরিৎবর্ণের পত্র শোভা পাইতেছে, কিন্তু কাণ্ডের দিকটি একেবারে শূন্য-গহ্বর কোটরে পরিণত। এই শৈবাল-আকীর্ণ আশ্রয় শীতাতপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পর্যাপ্ত নহে। আর তাহার প্রয়োজনও নাই, কারণ কামদমন ঝড়বৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের তলে বিচরণ করেন, প্রচণ্ড শীতে সিক্ত বস্ত্র পরিধান করেন এবং প্রখর রৌদ্রে চতুষ্পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া থাকেন। এই বৃক্ষকোটর যে তাঁহার আলয়, এই স্থানে তিনি যে কন্দ ও ফলমূল প্রভৃতি আহার্য রাখিতে পারেন, যজ্ঞাদির জন্য কাষ্ঠ, পুষ্প, কুশ সংগ্রহ করিয়া এখানে সঞ্চিত করিতে পারেন— এই নিশ্চিতিটুকুই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

আলয়ে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী অভ্যাগতদের উপবেশন করিতে

বলিলেন। ইহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে সন্ন্যাসী ইহাদের লইয়া আত্মপরীক্ষা করিতে চাহেন। যথোচিত সমীহ সহকারে তিনজনে বসিল। কামদমন পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত ইহাদের স্বাদু জম্বুফল খাইতে দিলেন। ইহারাও তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিল। ইত্যবসরে তিনি কজোৎসর্গ আসনে সমাসীন হইলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিঃস্পন্দ হইয়া আসিল, জানুবদ্ধ প্রস্তরবৎ কঠিন হইল, প্রলম্বিত বাহুদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল। কেমন করিয়া কি জানি, হস্ত পদের প্রত্যেক অঙ্গুলি প্রত্যেকটি হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। অস্থিচর্মসার বলিয়া তাঁহার দেহের নগ্নতা যেন লক্ষ্যগোচরই হইল না। তিনি তুরীয় মার্গে আরোহণ করিলেন। শ্রীদমন মাথাওয়ালা লোক বিধায় স্থির হইল সমস্ত ঘটনা সে বিবৃত করিবে। তাহার নবলব্ধ উন্নত দেহ লইয়া শ্রীদমন ক্ষীণকায় নন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল। পারম্পর্যক্রমে সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিল। পরিশেষে বলিল কি কারণে তাহাদের মনে সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগিয়াছে এবং কেন মনে হইয়াছে এই সংশয়ের নিরসন করিতে পারেন হয় রাজা কিংবা কোনো সন্ন্যাসী।

শ্রীদমন সকল ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিল। আমরা যে-ভাবে ও যে-ভাষায় এই কাহিনী বিবৃত করিয়াছি, তাহার বর্ণনা প্রায় তদ্রূপ হইল। তবে বিবদমান প্রশ্নটি পরিষ্কার রূপে উত্থাপন করিতে হইলে, সম্ভবতঃ শেষের ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু সন্ন্যাসী একান্তে নির্জনে যাহাতে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিতে পারেন, বোধ করি সেই উদ্দেশ্যে শ্রীদমন আদ্যন্ত সকল কথাই বলিল। সূচনায় নন্দের ও নিজের জন্মবৃত্তান্ত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে সখ্য সম্বন্ধ, স্বর্ণমক্ষী নদীতীরে কালক্ষেপ — এই সমস্ত ঘটনার কোনোটাই সে বাদ দিল না। নিজের কামার্ত অবস্থার কথা, সীতাকে প্রণয় জ্ঞাপনের কথা, সীতার সহিত তাহার বিবাহের কথা— এই সকল কথা প্রসঙ্গে সে সূর্যবন্দনা উৎসবে কিরূপে নন্দের সহিত সীতার প্রথম পরিচয় সংঘটিত হইল— তাহাও বর্ণনা করিল। তাহার আপন

বৈবাহিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সে পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিল। ইহার কারণ অবশ্য এমন নহে যে ওই-সকল বিষয়ে তাহার মনে এমন কোন সংকোচ আছে। যে-বাহু সূর্য-উৎসবে সীতাকে উর্ধ্বে উৎক্ষেপ করিয়াছিল, যে-দেহের বিষয় তাহার ভূতপূর্ব বাহুলগ্ন অবস্থায় সীতা স্বপ্ন দেখিত— এখন সেই বাহু ও সেই দেহ শ্রীদমনের। না, শ্রীদমনের সংকোচের কারণ অন্য। কোটর-আলয়ের এক কোণে সীতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া ছিল। এই-সকল প্রসঙ্গ সীতার পক্ষে প্রীতিপদ হইবে না বলিয়াই শ্রীদমন এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না।

এখন শ্রীদমন কেবল যে উন্নতদেহ তাহা নহে, উপরন্তু সে মাথাওয়ালাও বটে। সুতরাং তাহার বর্ণিত কাহিনী যে চিত্তাকর্ষক হইবে— তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এমন কি সীতা ও নন্দ পরম উৎসাহের সহিত শ্রীদমনের বর্ণনা শুনিল। ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা তাহাদের জ্ঞাত, কারণ ইহা তো তাহাদের নিজেদেরই কাহিনী। এই কাহিনীর ভয়াবহতা, লজ্জাকরতা সত্ত্বেও শ্রীদমনের মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাদের ভালই লাগিল। কজোৎসর্গ আসনে বদ্ধাসন অবস্থায় কামদমনের নিকটেও এই কাহিনী চিত্তাকর্ষক হইল বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীদমন বলিয়া চলিল কিভাবে প্রথমে সে নিজে ও তৎপরে নন্দ আপন আপন মুণ্ডচ্ছেদ করিল, দেবী সীতাকে কি বর দান করিলেন এবং দেহের সহিত মুণ্ড সংযোগ কালে কিভাবে সীতার ভুল হইয়া গেল। সর্বশেষে উপসংহারে পৌঁছিয়া সে কামদমনের নিকট নিজেদের সমস্যা উপস্থিত করিল :

'এবংপ্রকারে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। স্বামীর মাথা গিয়া যুক্ত হইল সখার দেহে, সখার মাথা স্বামীর দেহে। এক্ষণে প্রভু কামদমন! আমাদের এই সংশয়াকুল অবস্থায় আপনার বিজ্ঞজনোচিত আলোক-সম্পাত করুন। আমরা নিজেরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না বলিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি বিচার

করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য রহিব। আমাদের উভয়ের মধ্যে এক্ষণে কে এই বরাঙ্গনার ভর্তা, কে ইহার প্রকৃত স্বামী?'

নন্দ বেশ উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলিল :

'হাঁ, বলুন কামদমন, ন্যায্যত কে ইহার স্বামী?'

সীতা কিছু কহিল না। ঝটিতি অবগুণ্ঠন মোচন করতঃ প্রত্যাশার ভঙ্গিতে তাহার তুই কমললোচন কামদমনের দিকে নিবদ্ধ করিল মাত্র।

কামদমন হস্তপদের অঙ্গুলি একত্র করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। অতঃপর সম্মার্জনী তুলিয়া লইলেন এবং অতিথিদের সম্মুখের ভূমি কীটপতঙ্গমুক্ত করিয়া তাহাদের মুখোমুখি উপবেশন করিলেন। বলিলেন :

'হা হতোস্মি! আমার অদৃষ্টে এমনও ছিল! তাহা না হইলে তোরা তিনজন আমার নিকট আসিলি কেন? সূচনাতেই বুঝিয়াছিলাম তোদের মধ্যে স্থূল জৈবিক শক্তি ধূমায়িত। কিন্তু এই যে কাহিনী শুনিলাম ইহা এমনই স্থূল বাস্তবের ব্যাপার যে, ইহার মধ্যে ছুরিকাঘাত করিলে বোধ করি রক্তপাত হইবে। প্রখরতম গ্রীষ্মে আমার চতুষ্পার্শ্বে ধুনি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তপস্যা করা বরঞ্চ সহজ। কিন্তু তোদের উপস্থিতিতে যে অগ্নিবাষ্প নিরন্তর প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা যেন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দিবে— মনে হইতেছে। আমার মুখমণ্ডল যদি ভস্মদ্বারা সুচারুরূপে প্রলিপ্ত না থাকিত, তাহা হইলে হয়তো আমার গণ্ডাস্থির উপর যে সূক্ষ্ম চর্মের আবরণ রহিয়াছে, তাহা আরক্তিম হইয়া উঠিত। হায় হায় বৎসগণ! চোখবাঁধা বলদ যেমন ঘানির চতুর্দিকে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে তেমনই তোমরা সংসার-নামক ভ্রমিযন্ত্রের চতুর্দিকে কেবলই পরিভ্রমণ করিতেছ। কী যেন এক তুর্নিবার ক্ষুধা তোমাদের তাড়না করিতেছে। ষড়্‌রিপু যেন কলুর মতন কেবলই তোমাদের পুচ্ছ মলিতেছে! কেন রে বাপু, ক্ষান্ত দিলেই তো হয়। সে তো দূরের কথা, কামনার বস্তুটি

একবার দৃষ্টিপথে পড়িলেই হইল। তৎক্ষণাৎ চক্ষু ঘুরিয়া যায়, জিহ্বায় জল আসে আর বাসনার আতিশয্যে জানুদ্বয় শিথিল হইয়া পড়ে। আহা, আমার কাছে লুকাইবার চেষ্টা বৃথা। এ সমস্ত আমার যথেষ্ট জানা আছে। কামাতুর প্রণয়ী প্রিয়ার দেহ হইতে কী ধন যাচ্ঞা করে সে কি আমি জানি না ভাবিতেছ? কামজ্বরে আক্রান্ত স্বেদসিক্ত সেই দেহলতা, চন্দনসুবাসিত চীনাংশুকতুল্য মসৃণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দুই স্কন্ধদেশের মধ্যস্থ মালভূমি, আঘ্রাণপরায়ণ নাসিকা, লুব্ধ ওষ্ঠের লক্ষ্যস্থল উন্নত পয়োধরের উপরিস্থিত স্নেহসিক্ত কুচাগ্র, স্বেদসিক্ত কেশসংবলিত বাহুমূলের গহ্বর। প্রেমিক-করযুগের আনন্দ বিচরণের উপযোগী ক্ষেত্র এই নারীদেহ— চারু নিতম্ব, সুগঠিত জঙ্ঘা। মাংসল পৃষ্ঠদেশ, নাভিমূলে কামনার আবর্ত, বাহুলতায় বন্ধনসুখ, উদ্ভিন্ন-কোরকের ন্যায় উরু, পশ্চাদ্দেশে কঠিনকোমল স্পর্শশীতল শ্রোণীদ্বয়। অবশেষে কামলিপ্সার চরম মুহূর্তে যোনির আতপ্ত অন্ধকারে উদগ্র লিঙ্গের সম্প্রবেশ, সংযোগের মধ্যে উভয়ের প্রতিযোগ, বিবাদী-সম্বাদী সুরের একটি পরম মূর্ছনায় মিলিত হওয়ার স্বর্গীয় আনন্দ— ইত্যাদি সকল অবস্থার কথাই আমি সবিশেষ বিশদভাবে অবগত আছি।'

নন্দের কণ্ঠস্বর হইতে মনে হইল তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে। সে বলিল:

'প্রভো কামদমন! এই-সকল কথা তো আমাদেরই কথা। আমরাও ইহা বিলক্ষণ অবগত আছি। এইবার আপনি মূল প্রসঙ্গে আসুন ও আমাদের বলুন সীতার প্রকৃত পতি কে। তাহা হইলে তদনুসারে আমরা যথাকর্তব্য সাধন করিব।'

সন্ন্যাসী বলিলেন:

'বিধান তো একপ্রকার দেওয়া হইয়াই আছে। তোমাদের কাণ্ডজ্ঞানের এতই অভাব যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য নির্ধারণ করিবার জন্য বিচারকের সালিশ মানিতে হইবে— ইহা আমার নিকট অদ্ভুত

ঠেকিতেছে। এই সুমিষ্ট পিষ্টকখণ্ডটি সুনিশ্চিতভাবে তাহার অংশে পড়িবে যাহার স্কন্ধে আসিয়া বয়স্যের মাথা যুক্ত হইয়াছে। কারণ কিনা বিবাহ-অর্থে পাণিগ্রহণ এবং যেহেতু দক্ষিণ হস্ত হইল দেহের অঙ্গ, এ-ক্ষেত্রে সেই দেহের অধিকারী হইল বয়স্য।'

নন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার সুগঠিত পদের উপর ভর দিয়া প্রায় নৃত্যপর হইবার উপক্রম করিল। সীতা ও শ্রীদমন আনত শিরে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

কামদমন অতঃপর অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :

'এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা ভূমিকামাত্র। অতঃপর যে-চরম সিদ্ধান্ত আসিতেছে তাহা ইহাকে অতিক্রম করিবে ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আপাতত কিয়ৎকাল ধৈর্যধারণপূর্বক অপেক্ষা করো।'

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন। কোটর আলয়ের অভ্যন্তরে গিয়া একখণ্ড বল্কলে তাঁহার নগ্নতা আবৃত করিয়া পুনরায় ইহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন :

'সেই তো পতি যাহার দেহে পতির মাথা রাজে,
ইহাই জেনো সত্য চরম, অন্য কথা বাজে।
সুরের সুর, গানের গান, সুখের সুখ নারী,
সবার সেরা অঙ্গ মাথা— বিধান হল জারি।'

এইবার সীতা ও শ্রীদমন মাথা তুলিয়া পরস্পরের দিকে সানন্দে চাহিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে যে-নন্দের আনন্দ ধরিতেছিল না, সে এইবার হতাশ কণ্ঠে বলিল :

'কিন্তু এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলিলেন।'

কামদমন উত্তর দিলেন :

'শেষ কথা যাহা বলিলাম, তাহাই আমার চরম সিদ্ধান্ত।'

এইবার তাহারা যে-বিচারের উদ্দেশ্যে অরণ্যে আসিয়াছিল, সেই বিচারের রায় বাহির হইল। একে নন্দ এখন সুমার্জিত দেহের অধিকারী, তদুপরি তাহারই প্রস্তাবক্রমে এই সন্ন্যাসীকে সালিশ

মানা হইয়াছিল। নন্দের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এতদ্ব্যতীত ইহা তো স্পষ্টই প্রতীত হইল যে কামদমনের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত গেল সীতার অনুকূলে। ইহার মধ্যে যে-পুরুষসুলভ সৌজন্যের প্রকাশ হইল তাহার বিরুদ্ধতা নন্দ আর কি প্রকারে করে।'

তাহারা তিনজনে ভূমিতে আনত হইয়া কামদমনকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান করিল। বারিবর্ষণে শ্যামলশ্রী দণ্ডকারণ্যের ভিতর দিয়া তাহারা কিয়ৎদূর একত্রে চলিল, কেহ কাহারও সহিত বাক্যবিনিময় করিল না। অবশেষে নন্দ এক জায়গায় আসিয়া থামিল ও অপর দুইজনকে বিদায় সম্ভাষণান্তে বলিল :

'এবার আমি আমার পথে চলিব। তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমার পূর্ব সংকল্প অনুসারে আমি কোনো নির্জন স্থানে সন্ন্যাসজীবন যাপন করিব। সত্য বলিতে কি, আমার এই বর্তমান দেহান্তরে সংসারযাত্রা আমার পক্ষে নিরর্থক মনে হইবে।'

অপর দুইজন তাহার সংকল্প লইয়া কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। প্রতিযোগিতায় যে-ব্যক্তি পরাজিত হয় তাহার প্রতি বিজেতার একরূপ অনুকম্পা হয়। সেইরূপ কিঞ্চিৎ বিষাদমিশ্রিত করুণার সহিত ইহারা বয়স্যের নিকট হইতে বিদায় লইল। শ্রীদমন উৎসাহ দিবার ছলে, ইতিপূর্বে যাহা তাহার আপন পৃষ্ঠদেশ ছিল তাহার উপর চাপড় দিয়া, নন্দকে, অথবা তাহার দেহকেই, উদ্দেশ করিয়া কহিল, নন্দ যেন অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট না করে, যেন অতিরিক্ত কন্দ না খায়, যেহেতু তাহার দেহের পক্ষে একঘেয়ে আহার্য স্বাস্থ্যপ্রদ নাও হইতে পারে।

নন্দ সৌজন্যের বালাই না রাখিয়া কহিল :

'সে আমার ব্যাপার, আমি স্বয়ং বুঝিব।'

সীতা যখন সান্ত্বনাবাক্য কহিবার উদ্‌যোগ করিতে গেল নন্দ

তাহার অজনাসা-সংবলিত মস্তক ঘন ঘন সঞ্চালন করিতে লাগিল। সীতা কহিল :

'ইহা লইয়া দুঃখ করিও না। তুমি তো অন্নের জন্য জয়ী হইতে পারিলে না। তাহা ছাড়া এক্ষণে তো তুমিই আমার সহিত বিবাহের আনন্দ রীতিসম্মতভাবে সম্ভোগ করিবে। আমার সকল অঙ্গ দিয়া পূর্বে তোমার যে-অঙ্গ ছিল তাহার সেবা করিব, তাহাকে ভালোবাসিব। তোমার এই অঙ্গ হইতে যে-আনন্দ লাভ করিব তাহার জন্য কতভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা কেবল জগন্মাতা জানেন। আমার দুই হস্ত, আমার ওষ্ঠাধর কত যে বিচিত্রভাবে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিবে— তাহা কেবল আমি জানি এবং তিনি জানেন।'

অভিমানাহত কণ্ঠে নন্দ বলিল :

'যাও, যাও। এই সমস্তে আমার প্রয়োজন নাই।'

এইবার সীতা তাহার কানে কানে বলিল :

'মাঝে মাঝে তোমার মুখমণ্ডলও স্বপ্নে দেখিব।'

নন্দের ইহাতে কোনো ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সে কহিল :

'থাক, থাক, উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।'

এইরূপে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল— একজন থাকিল, অপর দুইজন চলিতে লাগিল। কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর সীতা ফিরিয়া আসিল ও নন্দকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল :

'বিদায়। তুমিই তো আমার সত্যকার প্রথম স্বামী, তুমিই আমার প্রেমচেতনা প্রথম জাগ্রত করিলে, ভালোবাসিতে শিখাইলে। আজ আমি প্রেম বলিয়া যদি কিছু জানি, সে তোমারই শিক্ষার গুণে। অরণ্যের ওই শুষ্কদেহ সন্ন্যাসী পত্নী ও মস্তক বিষয়ে যাহাই বলুন-না কেন, আমার জঠরে যে-সন্তান রহিয়াছে তাহা তোমারই ঔরসজাত।'

এত বলিয়া সে দ্রুতপদে সবলদেহ শ্রীদমনের নিকট চলিয়া গেল।

॥ নয় ॥

ধেনুকল্যাণে প্রত্যাবর্তনের পর সীতা ও শ্রীদমন অহোরাত্র ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহাদের এই মিলনের মেঘহীন আকাশে অনাগত দুর্দিনের ছায়া তখনও সমাগত হয় নাই। এই যে 'অনাগত' কথাটির মধ্যে একটি আশঙ্কার ভাব প্রচ্ছন্ন, ইহা নিঃসন্দেহে কাহিনীকারের। তিনি তৃতীয় ব্যক্তিরূপে বাহির হইতে ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, বর্ণনা করিতেছেন। অপিচ, যাহাদের জীবনযাপন লইয়া এই কাহিনী, তাহাদের মনে তখনও অনাগত দুর্দিনের লেশমাত্র রেখাপাত হয় নাই। তাহারা তখন এমন এক প্রমোদে মত্ত যাহা নাকি উভয়েরই নিকট স্বপ্নের অতিরিক্ত।

একমাত্র স্বর্গের নন্দনকাননে এরূপ আনন্দসম্ভোগ সম্ভবপর, মর্ত্যলোকে কদাচিৎ এরূপ ঘটিয়া থাকে। নৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আমাদের এই ইহজীবন সীমাবদ্ধ। এই-সকল সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের অংশে সচরাচর যে পার্থিব সুখের প্রাপ্তি ঘটে তাহা যৎসামান্য। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রার্থিত সামগ্রী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কাহাকেও-বা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার কেহ কেহ ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কামনা আমাদের সমুদ্রপ্রমাণ কিন্তু চরিতার্থ করিবার অবকাশ নয়ানজুলির ন্যায় দুই তটে বাঁধা। 'আহা, এমন যদি হইত', অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'এমন হইতে পারে না'— দ্বারা তিরস্কৃত হইতে থাকে। জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যাহাতে আমরা আয়ত্তগম্য অল্প লইয়া সুখে থাকি। যাহা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা না পাওয়া অধিক। পাওয়ার অতীতকে একদিন পাইব— ইহা স্বপ্নের ন্যায়, মরীচিকার

ন্যায় জীবনের পর্বে পর্বে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। এই যে স্বপ্ন, ইহা আমাদের কামনার স্বর্গ ; কারণ পৃথিবীতে দেওয়া-লওয়া, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে ব্যবধান, স্বর্গে তাহা নাই। সেখানে তাহারা এক। অনায়ত্ত প্রার্থিত ধন সেখানে আয়ত্তগম্য। এখানে যাহা নিষিদ্ধ তাহা সেইখানে সুসিদ্ধ। এখানে যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহা সেখানে দুর্লভ বস্তুর ন্যায় আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া উঠে। বুভুক্ষু ব্যক্তির স্বর্গ তো এই প্রকার রূপই পরিগ্রহ করিবে— ইহাতে আর আশ্চর্য কী ?

অদৃষ্টের এমনই লীলা যে পরিণীত প্রণয়ীযুগল ধেনুকল্যাণে প্রত্যাবর্তনের পর এই প্রকার অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হইল। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেরূপ প্রথম প্রথম প্রচুর পরিমাণে জল গলাধঃকরণ করে, ইহাদের প্রণয়সম্ভোগ সূচনায় এই প্রকারে চলিল। কামাতুর পতি ও বয়স্য প্রথমে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল, সীতা এক্ষণে পরম আনন্দের সহিত আবিষ্কার করিল যে দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়াছে এবং দৈবক্রমে দুইজনের প্রকৃষ্ট গুণাবলী একের মধ্যে সমাহৃত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যাহা বিশেষ ছিল এক্ষণে তাহা একের মধ্যে মিলিত হইয়া এমন এক ব্যক্তিস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা কিনা প্রায় কামনার অতীত। একদা স্বামীর বক্ষোলীনা অবস্থায় সীতা যে দুটি পেশলবাহুর স্বপ্ন দেখিত, এক্ষণে প্রতি রাত্রে পরিণীত জীবনের আনন্দসম্ভোগ কালে, সীতা সেই পেশল বাহুবন্ধে আত্মসমর্পণ করে। সেই বয়স্যদেহের পুলক এক্ষণে তাহার দেহে সঞ্চারিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে সে যখন কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে চাহিত, তখন কিন্তু তাহার চুম্বন বর্ষিত হইত সেই ব্রাহ্মণতনয়ের মুখমণ্ডলে। সীতার ন্যায় সৌভাগ্যবতী কে আর আছে ? তাহার এই স্বামীর মধ্যে উভয় অঙ্গের পরাকাষ্ঠা একত্রে যোজিত হইয়াছে।

রূপান্তরিত শ্রীদমনেরও আনন্দের অবধি নাই। তাহার পৌরুষে সে গর্বিত। শ্রীদমনের পিতা ভবভূতি, কিংবা তাহার মাতার (এই

আখ্যানে ইঁহার স্থান নিতান্তই গৌণ-বিধায়, মাতার নামের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না) মনে, পুত্রের এই রূপান্তরে কোনো ভাবান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই ব্রাহ্মণ বণিকের অন্যান্য জ্ঞাতিকুটুম্ব কিংবা মন্দিরশোভিত ধেনুকল্যাণ গ্রামের অন্য কোনো অধিবাসীর মনেও সেরূপ কোনো চিন্তার উদয় হয় নাই। শ্রীদমনের শারীরিক উৎকর্ষ যে কোনো অস্বাভাবিক কারণবশতঃ ঘটিয়াছে এবং সে-হেতু ইহা ন্যায়সংগত নহে (অবশ্য স্বাভাবিক হইলেই যে সব-কিছু সংগত হইবে ইহার কোনো প্রমাণ নাই)— এমন চিন্তা ইহাদের মনে জাগ্রত হইত তখনই যদি রূপান্তরিত নন্দ ওই স্থানে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু নন্দ তো সন্ন্যাসধর্মের প্রতি পূর্বেও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে এবং এক্ষণে গ্রাম হইতে বহু দূরে কোনো এক অরণ্যে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেছে। উভয় বন্ধুকে একত্রে দেখিলে তাহাদের অধুনাতন রূপান্তর হয়তো চোখে পড়িত। গ্রামে রহিয়াছে কেবল শ্রীদমন। যদিই বা কেহ অতর্কিতে তাহার সুগঠিত শ্যামল দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া ফেলিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় বলিত বিবাহের জল পড়িয়া শ্রীদমনের শারীরিক উন্নতি ঘটিয়াছে। সীতার স্বামী যে নন্দের মত রাখাল বালকের বেশে চলাফেরা করিবে না— ইহা তো সহজেই অনুমেয়। হ্রস্ব অধোবাস, হাতে তাগা, গলায় প্রবালের মালা ধারণ করিয়া শ্রীদমন লোকসমাজে বাহির হইবে— ইহা হাস্যকর। উত্তমাঙ্গের সহিত সংগতি রাখিয়া শ্রীদমন এখনও পূর্বের মত পায়জামা ও পিরাণ পরিধান করে। ইহা হইতে এই কথাই পুনঃপ্রমাণিত হয় যে মানুষকে চিনিবার ও চিহ্নিত করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট অঙ্গ হইল শীর্ষদেশ। পাঠক একবার কল্পনায় দেখুন : আপনি যে কক্ষে বসিয়া আছেন সেখানে আপনার পুত্র, ভ্রাতা কিংবা কোনো বন্ধু— আপনার সুপরিচিত তৎ তৎ মস্তক ধারণ-পূর্বক প্রবেশ করিলেন। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমনই হউক-না কেন, আপনার মনে কি সামান্যতম সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে এ-ব্যক্তি আপনার পুত্র কিংবা ভ্রাতা কিংবা বন্ধু নহেন।

অগ্রে শ্রীদমনের কথা না বলিয়া ঐ সীতার আনন্দের কথা অবতারণা করা হইল। ইহার কারণ আর কিছু নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে রূপান্তরিত হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীদমন বলিয়াছিল সীতার সুখকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হইবে। সত্য বলিতে কি, শ্রীদমনের আনন্দ কোনো অংশে সীতার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, এই মিলনসম্ভোগ তাহার পক্ষেও স্বর্গসুখবৎ প্রতীত হইতেছিল। নির্বন্ধাতিশয়-সহকারে আমি পাঠককে অনুরোধ করি— তিনি যেন নিজেকে শ্রীদমনের স্থানে একবার কল্পনা করিয়া দেখেন। তাহার প্রেয়সী অপরের অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য যেন ব্যাকুল, ইহা যখন সে বুঝিতে পারিল তখন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া সে সীতার নিকট হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল। এক্ষণে সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে সীতা যাহা-কিছু একান্তভাবে চাহিয়াছিল, তাহা সে দিতে পারে। এ কথা অনায়াসে বলা চলে যে সুন্দরী সীতার তুলনায় তাহার অদৃষ্ট যেন অধিকতর সুপ্রসন্ন। হিরণ্যের আভা-সম্পন্ন সুমন্ত্রদুহিতা সীতাকে তীর্থস্নানরতা দেখিবামাত্র শ্রীদমন তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। অমার্জিতরুচি নন্দ বন্ধুর প্রণয়াবেগ দেখিয়া যতই হাস্যপরিহাস করুক-না কেন, শ্রীদমন বুঝিয়াছিল এ-প্রেম এমন গভীর যে ইহার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যায়। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় শ্রীদমন তখন এমনই অভিভূত হইয়াছিল যে বিবসনার নগ্নতা ঢাকিবার উৎসাহে সে সীতাকে দেবীপদবাচ্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই যে মহিমময়ী মানসমূর্তি সে কল্পনা করিল, তাহার উদ্‌ভব কোথায়? কেবল ইন্দ্রিয়াবেগ দ্বারা তাহা তো সৃষ্ট হয় নাই। তৎসহ মিলিয়াছিল তাহার চিত্তবৃত্তি— এমন-কি তাহার সমস্ত ব্যক্তিসত্তা। আসলে ইহার মূলে ছিল তাহার ব্রাহ্মণজনোচিত বৈদগ্ধ্য। স্বয়ং বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদে ব্রাহ্মণেরা বাক্‌পটু, চিন্তাশীল ও কল্পনা-প্রবণ। শীর্ষদেশের উৎকর্ষের তুলনায় শ্রীদমনের দেহ ছিল অকিঞ্চিৎ-কর, অতি নম্র, অতি শিষ্ট। এই দুইয়ের বৈষম্য ধরা পড়িল শ্রীদমন

যখন সীতাতে উপগত হইল। পাঠক এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন কি-কারণে রূপান্তরিত শ্রীদমনের এত আনন্দ। এক্ষণে তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, ভাবনা, কল্পনার সহিত যোগ দিয়াছে একটি শক্তসমর্থ সহজ সুগঠিত দেহ— যাহা নাকি প্রণয়চিন্তাকে যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করিতে পারে। নন্দনকাননের আনন্দ এবং দেহ-মনের এই সুন্দর সংগতি পরস্পরের সহিত তুলনার যোগ্য।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উপরি-উক্ত বর্ণনায় 'অনাগত দুর্দিনের' কোনো উল্লেখ নাই। ইহা সংগত হইয়াছে, কারণ দুর্দিন যাহাদের তাহাদের চেতনায় এখনও পর্যন্ত উহার ছায়া পড়ে নাই। এখনও পর্যন্ত এই ছায়া রহিয়াছে আখ্যানকারের নৈর্ব্যক্তিক মনোরাজ্যে— যেখানে এই আখ্যান রূপ পরিগ্রহ করিতেছে— সেইখানে। কিন্তু এক্ষণে বলিতেই হয় যে অচিরে, অল্পকালমধ্যে ইহাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনের উপর এই ছায়াসম্পাত ঘটিতে আরম্ভ করিল। সম্ভবত সূচনা হইতেই পৃথিবী এমন-একটি পার্থিব ছায়ার সূত্রপাত করে, যাহার অস্তিত্ব স্বর্গলোকে অজ্ঞাত। এ কথাও স্বীকার করা উচিত দেবীর প্রত্যাদেশ নিতম্বিনী সীতা যেভাবে পালন করিল, তাহার মধ্যে ভুল ছিল। এই ভুলের মূল কোথায়? দেবীর আদেশ যথাসত্বর পালন করিতে গিয়া দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভাবে সীতা যে-ভুল করিয়া ফেলিল— তাহাতেই কি এই ভুলের মূল? না, ভুল হইল সেই যেখানে নিতান্ত দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য অবস্থা না হইলেও সীতা কেমন করিয়া যেন ভুল করিয়া ফেলিল। এই স্থানে যাহা বলা হইল তাহা ভালো করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলা, পাঠকগণ অবধান করিলে বুঝিতে পারিবেন।

এই সংসার মায়ার বশ, মায়া এই সংসারের জীবধর্মকে রক্ষা করে, পালন করে। ছলনা, প্রতারণা ও কল্পনা— এই তিন প্রকার অস্ত্রে মায়া মানুষের মনে কুহক বিস্তার করে। মানুষ যখন প্রণয়াসক্ত হয়, একজনের প্রাণ মন দেহ অন্যজনের প্রাণ মন দেহের প্রতি ধাবিত হয়; তখন সমাকর্ষণ সংযোগ ও সংশ্লেষের ফলে যে-মায়ার

সৃষ্টি হয় তাহাই হইল সংসার-জীবনের প্রধান উপজীব্য ; তাহারই ফলে মানুষ জীবধর্ম-পালনে তৎপর হয়। রতিকে কন্দর্পের সহচরী বলা হয় কেন, কেন বলা হয় রতি মায়াময়ী ? ইহার কারণ আর কিছু নহে, রতিদেবী যখন প্রেমিকের চক্ষে মোহ-অঞ্জন লাগাইয়া দেন তখন সকলই সুন্দর মনে হয়, মোহনীয় মনে হয়, লোভনীয় মনে হয়। 'রতি' কথাটির মধ্যেই ইন্দ্রিয়সুখকর একটি লাস্যের ভাব রহিয়াছে। এই ছলনাময়ী রতি দেবীই সীতার সুঠাম দেহকে লাবণ্যযুক্ত করিলেন, মোহগ্রস্ত পুরুষের পূজা ও কামনার উপযুক্ত করিয়া, সেই স্বর্ণমক্ষী কুণ্ডের ঘাটে তাহাকে স্থাপন করিলেন। কল্পনাপ্রবণ শ্রীদমনের চক্ষে মোহের অঞ্জন লাগিল। পাঠক একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, সৌন্দর্যের সহিত লাস্যের কি-প্রকার নিকট সম্বন্ধ ! অঙ্গের সৌষ্ঠবের সহিত মুখাকৃতির মাধুর্য যখন মিলিত হইল, যখন সীতা বদন ফিরাইল ও বন্ধুদ্বয় দেখিল সুগঠিত নাসিকা, সুমিষ্ট ওষ্ঠাধর, বঙ্কিম ভ্রূযুগলের নীচে একজোড়া হরিণ নয়ন— তখন সকল কিছু মিলিয়া যেন এক পরম সংগতি লাভ করিল। রূপের সহিত ভাব আসিয়া মিলিল। মোহগ্রস্ত হইলে মানুষের কি দশা হয়, সে-বিষয়ে আর কি বলিব। তখন মানুষ কেবল যে প্রেমাস্পদার সহিত প্রেমে পড়ে তাহা নহে, পরন্তু প্রেমের সহিত প্রেমে পড়ে। সে তখন প্রকৃতিস্থ থাকে না, থাকিবার ইচ্ছাও করে না। তখন সমস্ত হৃদয় দিয়া সে মোহগ্রস্ত হইয়া থাকিতে চাহে, ভ্রম-প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহে না।

এক্ষণে একটি বিষয় লক্ষণীয়। দুই বয়স্য অন্তরাল হইতে একটি নগ্ন নারীদেহ দর্শনে রত ছিল। সৌষ্ঠবযুক্ত দেহ দেখিয়া তাহারা মনে মনে আশা করিতেছিল যে হয়তো মুখখানিও সুন্দর হইবে। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মায়ার মহিমাবশতঃ দেহ দেহশীর্ষস্থ শিরের উপর নির্ভরশীল। কামদমন যে সমস্ত কথা বিচারপূর্বক ঘোষণা করিলেন শির শরীরের উত্তমাঙ্গ— ইহা তিনি 'ঠিকই

করিয়াছিলেন। মুখশ্রী সুন্দর হইলে প্রেমিকের দৃষ্টিতে সুন্দর দেহের মূল্য বৃদ্ধি পায়, প্রেমিক তখন সেই দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে-দেহের যে-মাপ তাহার পরিবর্তে যদি অন্য মাপ যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে-দেহ আর সেই দেহ থাকে না। কিন্তু এত বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। মুখের সামান্যতম একটি অংশের—এমন-কি কোনো একটি রেখার যদি অদলবদল হয়, তাহা হইলে সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। সীতার ভুল হইয়াছিল এইখানে। সে ভাবিয়াছিল স্বামীর মস্তকধারী বয়স্যের দেহখানা সে যদি লাভ করে তাহা হইলে তাহা স্বর্গসুখতুল্য হইবে। সূচনায় হইয়াছিলও তাহাই। কিন্তু তখন তাহার মনে হয় নাই, আর মনে হইলেও সে তখন ভুলিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল যে শ্রীদমনের মস্তকধারী নন্দের দেহখানা যথার্থভাবে নন্দের দেহ নহে। শ্রীদমনের সূক্ষ্ম নাসা, চিন্তাশীল কোমল দৃষ্টি, কোমল শ্মশ্রুতে আবৃত দুর্বল চিবুক—নন্দের সেই প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ সবল পেশল শরীরকে যেন অপর কোনো শরীরে পরিণত করিয়া দিল।

মায়ার অভিঘাতের পরমুহূর্ত হইতেই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া চলিল। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। পূর্বেই বলিয়াছি অনাগত-পূর্ব কাল অবধি সীতা ও শ্রীদমন ইন্দ্রিয়সম্ভোগের পরিপূর্ণ আনন্দে কালাতিপাত করিল। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। বয়স্য নন্দের দেহ যাহা নাকি এতকাল তাহার একান্ত কামনার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা সীতার আয়ত্তগত। কিন্তু শ্রীদমনের মস্তক সংবলিত নন্দের দেহখানাই কি সত্যকার বয়স্য-দেহ? বাস্তবিক পক্ষে কালক্রমে সুদূরবর্তী সেই স্বামীদেহখানাই বয়স্য-দেহে পরিণত হইতে লাগিল। এই পরিবর্তন সাধন হইল স্বভাবের নিয়মে, এইজন্য মায়া বা ইন্দ্রজালের প্রয়োজন হইল না। স্বামীর মস্তক সংবলিত নন্দ-দেহও, মস্তকের প্রভাবে ক্রমে স্বামীদেহে পরিণত হইতে লাগিল।

এইরূপই সচরাচর হইয়া থাকে—বিবাহিত জীবনের ইহাই

অনিবার্য পরিণাম। আজ যে মধ্যবয়সী রমণী তাহার শ্লথগমন মেদবহুল স্বামীর মধ্যে, অতীতের চপল চটুল তরুণ প্রণয়ীকে না পাইয়া আশা-ভঙ্গের বেদনায় কাতর হয়, সীতার মনের অবস্থা তদনুরূপ হইল। অবশ্য এই স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যে বিশেষ একটি কার্য-কারণের সম্বন্ধ ছিল।

শ্রীদমনের মাথার প্রভাব সর্বপ্রথম দেখা গেল যখন সীতার পরিণীত স্বামী পূর্ব-অভ্যাস অনুযায়ী তাহার নবলব্ধ দেহকে সুসভ্য-বেশে সজ্জিত করিতে লাগিল। নন্দের কৃষ্ণগোপাল দেহখানা পরিচ্ছদে আবৃত হইল। নন্দের অভ্যাস ছিল আপন দেহখানি তৈলমর্দনে সুচিক্কণ রাখা। শ্রীদমন আবার আপন শরীরে সর্ষপ তৈলের গন্ধ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সর্ষপ তৈলের ব্যবহার যখন বন্ধ হইল, সীতা যে খুব সুখী হইল তাহা নহে। আরও একটি বিষয় লইয়া সীতার মনে কেমন একটা আক্ষেপের উদয় হইল। বয়স্য নন্দের উপবেশন করার অভ্যাস ছিল তাহার স্বভাব অনুযায়ী। গ্রাম্য রীতিতে উবু হওয়া বসিতে পারিলে সে সর্বাপেক্ষা আরাম অনুভব করিত। মার্জিতরুচি শ্রীদমন বসিত পাশ ফিরিয়া, পদদ্বয় যুক্ত করিয়া। রূপান্তর হইলেও পূর্ব অভ্যাস সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। এই সকল ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া সীতার হা-হুতাশ করা,— ইহা কিন্তু নিতান্তই অনাগত-পূর্ব কালের কথা।

ব্রাহ্মণসন্তান শ্রীদমন নন্দের দেহ ধারণ করিলে কি হয়, সে শ্রীদমনই থাকিল এবং যথাপূর্ব অভ্যস্ত জীবন যাপন করিতে লাগিল। সে কর্মকার নহে গোপালকও নহে। সে বণিজপুত্র বণিক, ব্যবসায় পরিচালনায় সে পিতাকে সাহায্য করে। পিতা যখন জরাগ্রস্ত হইলেন তখন পুত্র ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করিল। সে না চালাইল হাতুড়ি, না চরাইল গোরু। মলমল, রেশম, পশম, কর্পূর, উদুখল, চকমকি-প্রভৃতি কেনা-বেচা করিয়া ও ধেনুকল্যাণ গ্রামের লোকেদের চাহিদা মিটাইতে গিয়া, তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অবসর

পাইলে সে বেদাধ্যয়নও করিত। ক্রমে তাহার নন্দ-বাহুদ্বয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে আরম্ভ করিল, তাহার বক্ষঃপট সংকীর্ণতর হইয়া আসিল এবং কায়িক পরিশ্রম হ্রাস পাওয়ায় উদরপ্রদেশে মেদের সঞ্চার হইল। সে যেন অল্পে অল্পে স্বামীদেহের স্বরূপে ফিরিয়া আসিল। ইহা আপাতদৃষ্টিতে যতই কৌতুকাবহ মনে হউক-না কেন, এই রূপান্তরে আশ্চর্য বোধ করিবার বিশেষ কোনো হেতু নাই। এমন-কি ধেনুপুচ্ছলাঞ্ছন যে-রোমরাজি তাহার বক্ষঃপটে শোভা পাইত, তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন না হইলেও যেন ক্ষীণতর হইয়া আসিল। ইহাতে সীতা ক্ষুণ্ণ হইল— এ কথা বলা বাহুল্য। শ্রীদমনের দেহে যে রূপান্তর ঘটিতে লাগিল তাহা অংশত ব্রহ্মণ্যজনোচিত অংশত করণিকসুলভ। যাহা গ্রাম্য, পেশল ও অমার্জিত ছিল, ক্রমে যেন তাহা সুসংস্কৃত হইয়া উঠিল। এই পরিবর্তনের মধ্যে কতখানি মায়া ও কতখানি প্রকৃতির নিয়মের অন্তর্গত—সে কথা নিশ্চিত বলা শক্ত। তবে, দেখা গেল শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের বর্ণ ক্রমশঃ যেন গৌর হইয়া আসিতেছে. হস্ত-পদ আকারে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, অস্থি ও জানুবন্ধ প্রভৃতি পূর্বের তুলনায় সুসম ও সুগঠিত বলিয়া মনে হইতেছে। অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে-হাস্যচপল বয়স্য-দেহ নন্দের উত্তমাঙ্গেরও অধিক ছিল, আজ তাহা নিতান্তই শ্রীদমন-শিরের নগণ্য নিরীহ পরিপূরকে পরিণত। এই শীর্ষদেশে যে-সকল প্রণয় সংক্রান্ত ভাবনা-কামনা জাগিত, তাহার সহিত এই দেহ যদি পরিপূর্ণ সংগতি রক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে স্বর্গের তুল্য সুখ আয়ত্তগম্য হইত। কিন্তু ক্রমে শ্রীদমনের মস্তকধারী নন্দ-দেহের ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই যেন হ্রাস পাইতে লাগিল। পরস্পরের সঙ্গদানে দেহের সহিত মাথার যেন বিরোধ ঘটিতে লাগিল।

প্রথম মিলনের মধুময় দিনগুলি অতিবাহিত হইলে পর সীতা ও রূপান্তরিত শ্রীদমনের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা যেন নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নন্দদেহ যে সম্পূর্ণভাবে শ্রীদমন-দেহে

পর্যবসিত হইল— এমন নহে। তাহা হইলে তো পরিবর্তনের কোনো প্রসঙ্গই হইত না— সকল বিষয়ই যথাপূর্বম্ হইয়া যাইত। আমাদের এই আখ্যায়িকায় আমরা অতিশয়োক্তি পরিহার করিতে চাই। আমরা বরঞ্চ বিশদভাবে বলিতে চাহি যে দেহের রূপান্তর অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে নাই। পরিবর্তন যাহা ঘটিল, তাহা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-প্রতীকের মধ্যে আবদ্ধ রহিল। ইহা হইতে প্রতীতি হইবে যে এই পরিবর্তনের মূলে ছিল শির ও শরীরের পারস্পরিক সম্বন্ধ। এমন-কি এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে নূতন দেহের প্রভাবে শ্রীদমনের অহংভাবের কেন্দ্রস্থলে তাহার শীর্ষদেশেও কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা দেখা গিয়াছিল। শারীর-বিজ্ঞানের দিক হইতে হয়তো বলা চলে যে শরীরে এমন অনেক নাড়ীগ্রন্থি রহিয়াছে যাহার রস শির ও শরীর উভয়েরই উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু বিজ্ঞান এই প্রকার বিষয়ে যাহা বলিতে পারে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক বলিতে পারে মনস্তত্ত্ব ও দর্শন।

এক প্রকার সৌন্দর্য আছে যাহা মনকে নাড়া দেয়, এক প্রকার সৌন্দর্যের আবেদন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে। কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। জগতে এই দুই বিভিন্ন মতের বিরোধ দেখা যায়। এইজন্য শাস্ত্রে বলে যে আনন্দের অনুভূতি দুই প্রকারের— এক প্রকার আনন্দ আছে যাহা শরীর উপভোগ করে। আর-এক প্রকার আনন্দ আত্মার শান্তির ন্যায় হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। এই উক্তির অর্থ হইল এই যে সুন্দরের সহিত আত্মার যে-সম্বন্ধ, অসুন্দরের সহিত সেই প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না— এই উভয় প্রকার সম্বন্ধ সমার্থক নহে, সমপর্যায়ভুক্তও নহে। আত্মিক সৌন্দর্য অর্থে আমরা এই বুঝি যে ইহা সেই সৌন্দর্য যাহা অনুভূতিগোচর এবং যাহা আমাদের ভালো লাগে। আমাদের এই ভালো লাগার জিনিসকেই আমরা মনের জিনিস কিংবা আত্মার জিনিস মনে করিয়া সুখ পাই। আর যাহাই হউক

এই ভাল-লাগা বা প্রেম, ইহা ইন্দ্রিয় কিংবা অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারে না। ইহা অশরীরী নহে। শরীরী ভাবে যাহা সুন্দর, তাহার আত্মার সৌন্দর্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। মন কেবল মনকে প্রণয় করিবে—শরীরের ধার ধারিবেনা এবং শরীর কেবল শরীরকে প্রণয় করিবে—মনের ধার ধারিবে না, এইরূপ যদি নিয়ম হইত তাহা হইলে জীবন দুর্বিষহ হইত। সৌভাগ্যক্রমে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে শরীর ও মন উভয়েরই বিশেষ বিশেষ স্থান রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে শরীর ও মনের মধ্যে একটা পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই পৃথিবীর যাবতীয় লোক এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ও মিলন সাধন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই লক্ষ্য সাধন করিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদবশত কি প্রকার বিপর্যয় ঘটিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের এই আখ্যান।

ভবভূতিপুত্র শ্রীদমনের মাথায় ছিল সুন্দরের চিন্তা, সে ভালবাসিত সুন্দর মুখ ও সুগঠিত অঙ্গের সৌষ্ঠব। তাহার যখন রূপান্তর ঘটিল, তখন ভ্রমক্রমে তাহার এই মাথার সহিত যুক্ত হইল সুন্দর সুগঠিত শক্তসমর্থ একটি শরীর। যাহা দূর এবং অনায়ত্ত ছিল বলিয়া আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা তাহার একান্ত নিজস্ব হইয়া গেল। নিজে যাহা ছিল না সে তাহাই হইল, চাওয়ার বস্তু এখন হাতে পাওয়া গেল। ইহা কিন্তু শ্রীদমনের নিকট অবিমিশ্র আনন্দের কারণ রহিল না। প্রথম হইতেই তাহার চিত্তে কেমন একটি যেন বিষাদের স্পর্শ লাগিল। রূপান্তরের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে নূতন শরীরের সহিত যতই তাহার মনের বুঝাপড়া চলিতে লাগিল, ততই যেন এই বিষাদের ভাবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনের এই পরিবর্তনের একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা দিল এইভাবে— সুন্দর যখন দেহধারণ করিয়া ধরা দিল, তখন সুন্দরের প্রতি পূর্বের আকর্ষণ যেন ক্ষীণ হইয়া আসিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদমনের অধ্যাত্ম সৌন্দর্যও যেন ম্লান হইতে আরম্ভ করিল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রীদমনের রূপান্তর না ঘটিলেও হয়ত এই প্রকার পরিবর্তন ঘটিত, কারণ এক্ষণে সুন্দরী সীতা একান্তভাবে তাহারই অঙ্কশায়িনী। বাস্তবিক পক্ষে সচরাচর এইরূপই ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি বিশেষ ঘটনার সমাবেশে এই সকল সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার এই আখ্যানে বিশেষ রূপ লইয়াছে। নিরাসক্ত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর ন্যায় যাঁহারা এই কাহিনী শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট রূপান্তরজনিত পরিবর্তনাদি বিস্ময়কর না হইবারই কথা। হাঁ, কৌতূহল-উদ্দীপক সন্দেহ নাই, কিন্তু সচরাচর এইরূপই তো ঘটিয়া থাকে। সুন্দরী সীতা কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রাথমিক উদ্দামতা অবসিত হইলে পর সে সখেদে লক্ষ্য করিতে লাগিল তাহার স্বামীর সূক্ষ্ম ও সুগঠিত ওষ্ঠাধর ক্রমে ক্রমে স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠিতেছে। পূর্বের সেই ক্ষুরধার শাণিত নাসাও যেন ধীরে ধীরে মেদযুক্ত হইয়া খর্বকায় অজনাসিকায় পর্যবসিত হইতে চলিল। অক্ষিযুগে পূর্বে যে মননশীলতা ছিল, তাহার স্থলে কালক্রমে কেমন একপ্রকার গ্রাম্য রসিকতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। পরিণামে যে রূপান্তর ঘটিল তাহা এক অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। নন্দের দেহখানা যতই সুসভ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, শ্রীদমনের মুখখানা ততই যেন গ্রাম্যজনোচিত হইতে লাগিল। যে-দুই মূল উপাদানে রূপান্তরিত ব্যক্তির উদ্ভব— বিমিশ্র হইয়া তাহা এমন আকার ধারণ করিল যে, আদি উপাদানের সামান্যই অবশিষ্ট রহিল। এই অবস্থায় সীতা যদি দূরদেশবর্তী বয়স্যের কথা চিন্তা করিয়া থাকে, যদি মনে ভাবিয়া থাকে যে নন্দের শরীরে ও মনে তাহা হইলে অনুরূপ পরিবর্তনাদি ঘটিয়া থাকিবে— তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আখ্যানকারের অনুরোধ, শ্রোতাগণ যেন সীতার অবস্থার কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন।

সুন্দরী সীতা এখন প্রায়ই তাহার সেই স্বামীদেহের কথা চিন্তা করে, সে-দেহ তাহাকে পরিপূর্ণ সুখ দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু

তাহাই ছিল মন্ত্রঃপূত পরিণীত শরীর—যাহা নাকি তাহাকে আসঙ্গ লিপ্সায় উদ্দীপিত করিয়াছিল। সেই যে-দেহ—যাহা তাহার ছিল, তাহা এখন আর তাহার নহে। যেহেতু এখন তাহা বয়স্যদেহে পরিণত, এ-দেহ সে যেন কদাপি উপভোগ করে নাই। শ্রীবৎসপুচ্ছলাঞ্ছিত রোমরাজি এখন কোন্ বক্ষঃপটে শোভা পাইতেছে—সীতার সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সে ইহাও নিশ্চিত জানে, বন্ধুবৎসল নন্দের বয়স্য-মুখাকৃতি, শ্রীদমন-শরীরের প্রভাবে এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা মার্জিত হইয়া থাকিবে—যেমন মার্জিত হইয়াছে শ্রীদমনের মস্তক-সম্বলিত বয়স্য-দেহ। এই সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা করিয়া সীতা ব্যাকুল হইয়া পড়িল, দিনে রাত্রে তাহাকে এই এক চিন্তা যেন অধিকার করিয়া বসিল। রূপান্তরিত শ্রীদমনের বাহুলগ্ন অবস্থাতেও তাহার মনে ওই এক চিন্তা। দূরবর্তী সেই সঙ্গী-বিহীন স্বামীদেহের কথা সে ভাবে। সে-দেহ না জানি কেমন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। দেহশীর্ষে মার্জিত-আকৃতি বয়স্য নন্দের বিষাদ-করুণ মুখখানি সে যেন কল্পনায় দেখিতে পাইল। এই স্বামীদেহ হইতে বিচ্ছেদ সীতার পক্ষে বেদনা-দায়ক হইয়া উঠিল। দূরবর্তীর জন্য তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, আকুল হইয়া উঠিল। শ্রীদমনের দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গনে সীতা যখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া এলায়িতদেহে শুইয়া থাকিত, তখন বিরহবেদনায় তাহার থরথর কম্পিত কামাতুর দেহ ক্ষণে ক্ষণে পাণ্ডুর হইয়া আসিত।

॥ দশ ॥

দশমাস দশদিন অতীত হইলে পর সীতা যথাকালে শ্রীদমনের ঔরস-সম্ভূত এক পুত্রসন্তানের জন্ম দান করিল। বালকের নাম রাখা হইল সমাধি, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাহৃত সামগ্রীর সমষ্টি। নবজাতকের মঙ্গলকামনায় সামাজিক প্রথামত তাহারা সমাধির দেহের উপর চামর ব্যজন করিল, তাহার কপালে গোময়ের টীকা লেপন করিল। পিতা শ্রীদমন (রূপান্তরিত শ্রীদমনকে যদি পিতা বলা যায়) ও মাতা সুন্দরী সীতার আনন্দের অবধি রহিল না। সীতা পূর্বে আশঙ্কা করিয়াছিল যে সন্তান হয়ত রক্তশূন্য ও জন্মান্ধ হইবে। সমাধির ত্বকের বর্ণ পাণ্ডুর। বোধ করি মাতৃবংশের ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে ইহার উদ্ভব। পরবর্তী কালে লক্ষ্যগোচর হইল যে তাহার দৃষ্টি ক্রমশ যেন ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে লোকশ্রুতি-অনুসারী ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

কালক্রমে ক্ষীণদৃষ্টির কারণে সমাধির নাম হইল অন্ধক এবং এই উপনামে সে পরিচিত হইল। দৃষ্টির ক্ষীণতাহেতু তাহার মৃগনয়নে এমন একটি কোমল আকুলতার ভাব প্রকাশ পাইত যে সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত। সীতার চোখের সহিত বালকের চোখের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। মোটামুটি বলিতে গেলে, তাহার দুই পিতার সহিত তাহার যতটা না মিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক মিল তাহার মাতার সহিত। যে-সকল যৌগিক উপাদানে তাহার দেহ গঠিত, তাহার মধ্যে মাতার অংশই প্রধান। সুতরাং বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন যদি তাহার মাতার অনুরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। চিত্রপটের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য। কন্থা-প্রভৃতি যখন অপগত হইল, দেখা গেল বালকের শরীর যেমন সবল তেমনই সৌষ্ঠব-

যুক্ত। শ্রীদমন সমাধিকে আপনার রক্তমাংস-জ্ঞানে প্রীতি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মনে এই প্রতীতি জাগল যে পুত্রের জীবনেই যখন তাহার জীবন, তখন বৃথা প্রাণ ধারণ করিয়া কী লাভ। এই ভাবে সে যেন ক্রমেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িল।

সমাধি-অন্ধক যে-সময় মাতৃক্রোড়ে লালিত হইতেছে, যখন দোলনায় দুলিতেছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীদমনের মুখাকৃতিতে ও শরীরে পরিবর্তন ঘটিতে শুরু হইয়াছে। এই সময়ই তাহার শরীর নিঃসন্দেহে স্বামীদেহে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। সীতার নিকট এই পরিস্থিতি অসহনীয় হইয়া উঠিল। সুদূরস্থিত বয়স্যকে শিশুপুত্রের জনকরূপে কল্পনা কবিয়া তৎপ্রতি সীতার হৃদয় আকুল আগ্রহে ধাবিত হইতে লাগিল। না জানি সে কেমন আছে, দুই উপাদান সংমিশ্রণের ফলে তাহার দেহের কিরূপ দশা ঘটিয়াছে, আপন ঔরসজাত শিশুপুত্রকে দেখিলে সে কত-না আনন্দ লাভ করিবে— এই সকল প্রশ্ন নিরন্তর তাহার হৃদয় উদ্‌বেল করিল। কিন্তু এইসব কথা তো স্বামীর মুখাকৃতি-সম্পন্ন লোকটিকে বলা চলে না। সমাধির বয়ঃক্রম যখন চার বৎসর হইল, যখন অন্ধক-নামে তাহাকে বেশী লোকে চিনিতে লাগিল, যখন সে টলিতে টলিতে ছুটিয়া চলে এবং ছুটিয়া চলিলে পড়িয়া যায়— সেই অবস্থায় শ্রীদমন বাণিজ্যব্যপদেশে গ্রামান্তরে প্রস্থান করিল। সেই অবসরে সীতা মনঃস্থির করিয়া ফেলিল, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, নির্জনে তপোরত নন্দকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবে ও তাহার আনন্দ-বিধান করিবে।

তখন বসন্তকাল। ভোর রাত্রের প্রদোষ অন্ধকারে একদিন সীতা তীর্থযাত্রীর সাজে সাজিল, কোমল চরণে উপানৎ পরিল, কোমল হস্তে যষ্টি তুলিয়া লইল, পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিল আহার্যবস্তুর পেটিকা, শিশু-পুত্রকে কালিকট হইতে আনীত তন্তুজ বস্ত্রের পিরান পরাইল। অতঃপর পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তারার আলোকে পথ চিনিয়া দুইজনে বাহির হইল। তখন সমস্ত গ্রাম

নিদ্রামগ্ন, মাতা ও পুত্র যে গৃহ ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল— ইহা ভাগ্যক্রমে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

তীর্থযাত্রার বিঘ্ন অনেক, বিপদ বহুতর। তৎসত্ত্বেও সে যে সাহসে ভর করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, ইহা হইতে অনুমান করা যায় নন্দের সহিত মিলিত হইবার বাসনা তাহার কিরূপ প্রবল। তাহার ধমনীতে যে ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত, ইহাই এই সাহসের ভিত্তি। এতদ্ব্যতীত তাহার নিজের ও শিশুপুত্রের অতুলনীয় রূপ ছিল তাহাদের সহায়। তীর্থযাত্রার পথে পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইল, তাহারা সকলেই ইহাদের অগ্রগমনে উৎসাহ দিল ও সহায়তা করিল। সীতা সকলকে বলিল যে, সে তাহার শিশুপুত্রের পিতার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। সত্যের সন্ধানে তাহার স্বামী নাকি বিবাগী হইয়াছে ও অরণ্যের অভ্যন্তরে তপশ্চরণে রত রহিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল শিশুপুত্রকে সন্ন্যাসী স্বামীর সমক্ষে উপস্থিত করিবে যাহাতে পিতা পুত্রকে আশীর্বাদ করেন ও সত্যধর্মে দীক্ষা দান করেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল সহযাত্রীর মন তৎপ্রতি আর্দ্র ও করুণাপরবশ হইল ও তাহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই তীর্থযাত্রিনীর পথ সুগম করিবার জন্য যত্নবান হইল। পথিপার্শ্বে বহুতর গ্রাম ও চটি পড়িল, সীতাকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইল না, উপরন্তু বালকের জন্য যথাপ্রয়োজন দুগ্ধও সংগৃহীত হইল। কখনও কোনো কৃষকের খামার বাড়িতে, কখনও বা কুম্ভকারের চুল্লীর সন্নিহিত কবোষ্ণ ভূমিতে সে অনায়াসে রাত্রিযাপন করিল। পথ চলিতে চলিতে কখনো ধান বা শস্য বোঝাই কোনো সম্পন্ন চাষীর গোরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পথশ্রম অপনোদিত হইল। আবার যে-পথে যানবাহন চলে না, সেইরূপ ধূলিধূসর পথে যষ্টি-হস্তে সীতা অগ্রসর হইয়া চলিল। এক হস্তে দণ্ড অন্য হস্তে অন্ধকের মুষ্টি— এইরূপে সে দৃঢ়পদে চলিতে লাগিল। সে যখন এক পা অগ্রসর হয় অন্ধক তখন দুই পা চলে।

ক্ষীণদৃষ্টি অন্ধক সম্মুখের পথ কতটুকুই-বা দেখিতে পায়। সীতার দৃষ্টি সুদূর দিগন্তে নিবদ্ধ, আরও অনেকখানি পথ অতিক্রম করিয়া সে তাহার অনুকম্পার লক্ষ্য, তাহার পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তুর সম্মুখে উপনীত হইতে পারিবে।

এইরূপে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর সীতা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিল। সে মনে মনে জানিত বয়স্য এই অরণ্যের নির্জনতায় আত্ম-গোপন করিয়া আছে। সাধুসন্ন্যাসীরা সীতাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেও বলিল নন্দ অরণ্যে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত জানিত সে কোথায় আছে, কেহ হয়তো জানিত না। কিন্তু মুনিপত্নীদের কেহ কেহ দয়াপরবশ হইয়া সমাধিকে আদর-যত্ন করিল, কেহ বা সীতাকে বলিয়া দিল নন্দ কোথায় অবস্থান করিতেছে। এই যে সাধুদের রাজ্য, ইহার সহিত গার্হস্থ্য সংসারের সামান্যই পার্থক্য, এই দেশে প্রবেশাধিকার যে পাইল, সে ইহার হালচাল সম্বন্ধে সকল গূঢ় কথা জানিতে পারে। সংসার হইতে দূরে এই বানপ্রস্থেও সেই একই প্রকার ঈর্ষা বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চা। প্রতিটি তপস্বী ভাল করিয়াই জানেন অপর তপস্বীরা কে কোথায় রহিয়াছেন, কোন্ কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। লোকপরম্পরায় নন্দমুনির বিষয়ে ইহারা অবগত ছিলেন বলিয়া মুনিপত্নীরা সীতাকে বলিতে পারিলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিমে সাত দিনের রাস্তা অতিক্রম করিলে পর, গোমতী নদীর তীরে নন্দের আশ্রমে পহুঁছানো যাইবে। যে স্থানে নন্দের আশ্রম সে-স্থান অতি মনোরম। নানা আকারের তরুরাজি, নানা জাতির ফুল ফল লতা ও গুল্মে সে আশ্রম সুশোভিত। পক্ষীকূজন-মুখর সেই তপোবনে যূথবদ্ধ গৃহপালিত পশু বিচরণ করে। নদীতীরে শ্যামল শষ্প ও কন্দ মূল প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে উপজাত হয়। সকল দিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় নন্দের তপোবন প্রায় উপবনের ন্যায় নয়ন-মনের আনন্দদায়ক। তপস্বীদের মধ্যে যাঁহারা কঠোর তপশ্চরণে রত, নন্দের সন্ন্যাসগ্রহণকে তাঁহারা খুব

বেশী মূল্য দিবেন না। স্নান ও মৌনাবলম্বন ব্যতীত আর কোনো ব্রতসাধনে তাহার উৎসাহ নাই। বনের ফলমূল যাহা কিছু সে হাতের কাছে পায়, নির্বিচারে ভক্ষণ করে। চতুর্মাস্যের সময় অরণ্যজাত ধান্যবীজের মণ্ডের সহিত কখনো-বা অগ্নিঝলসিত পক্ষীমাংসও সে পরমানন্দে চর্বণ করে। অল্প কথায় বলিতে গেলে, তাহার এই নির্জনে ধ্যানধারণার সহিত হতাশ প্রেমিকের নির্জনবাস ও হা-হুতাশের সামান্যই তফাত। নন্দের এই তপোবনে পহুঁছিবার পথে বিশেষ কোনো বিঘ্ন বা বিপদ নাই। দস্যুতস্কর-অধ্যুষিত গিরিবর্ত্ম, হিংস্র শ্বাপদসংকুল বনপথ ও সর্প-সরীসৃপ-পরিবৃত মাল-ভূমি সাহসে নির্ভর করিয়া অতিক্রম করিলে নন্দের আশ্রমে পহুঁছানো কষ্টসাধ্য হইবার কথা নহে।

এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া সীতা দণ্ডকারণ্যের সহৃদয় মুনিপত্নীদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল ও নবীন আশায় ভর দিয়া পুনরায় পথে বাহির হইল। প্রেমের দেবতা কামদেব ও ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর প্রসাদে বাধা-বিপদ অতিক্রম করিয়া সে প্রতিদিন অগ্রসর হইয়া চলিল। দস্যুতস্কর-অধ্যুষিত গিরিবর্ত্ম সে অক্ষতদেহে পার হইয়া গেল। মিত্রভাবাপন্ন রাখাল বালকদিগের সহৃদয়তাক্রমে শ্বাপদসংকুল বনপথ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিল। এইবার পথে পড়িল সর্প সরীসৃপ-পরিবৃত মালভূমি— এই স্থানে সীতা শিশুপুত্র সমাধি-অন্ধককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল ও সন্তর্পণে বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করিল।

গোমতী নদীর তীরে আসিয়া সীতা অন্ধককে ক্রোড় হইতে নামাইল ও পূর্বের ন্যায় এক হস্তে তাহার ক্ষুদ্রমুষ্টি ধারণ করিয়া এবং অন্য হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। তখন প্রাতঃকাল, শিশিরসম্পাতে তরু-তৃণ-শস্পরাজি সূর্যালোকে ঝিকিমিক করিতেছে। কিয়দ্দূর অবধি তাহারা পুষ্পাবৃত নদীতীর ধরিয়া চলিল। একপার্শ্বে সমতলভূমি, তাহার অপর পারে উপবনের শীর্ষে তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইতেছে। নবোদ্ভিন্ন অশোক ও কিংশুকের রঙে

সমস্ত উপবন রঙীন, মনে হইল—যেন অরণ্যশীর্ষে আগুন লাগিয়াছে। বালারুণের উজ্জ্বল আলোকে চোখে যেন ধাঁধা লাগে। সীতা প্রসারিত করতলের ছায়া হইতে দেখিতে লাগিল—উপবনের মধ্যে একখণ্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণ, তৎপার্শ্বে তৃণাচ্ছাদিত একটি কুটির, কুটিরের পশ্চাদ্ভাগে বল্কলপরিহিত একটি যুবক কুঠারহস্তে কী যেন করিতেছে। নিকটতর হইলে পর সীতা দেখিল—যুবকের বাহুদ্বয় তাহার পূর্বপরিচিত সবল পেশল বাহুদ্বয়ের অনুরূপ, স্মরণ হইল এইরূপ দুটি বাহু সূর্য-উৎসবে তাহাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করিয়াছিল। নাসিকা কিঞ্চিৎ নিম্নমুখী, ওষ্ঠপুট নাতিস্থূল। মোট কথা, সকল মিলিয়া মুখাকৃতি আর অজতুল্য নহে, বরঞ্চ মার্জিত।

উহাকে দেখিয়া সীতার মনে হইল যেন করুণারসঘন কৃষ্ণ অবতার তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সীতা কহিল :

'নন্দ, দেখ দেখ। সীতা তোমার আসিয়াছে।'

হস্তধৃত কুঠারখানি ফেলিয়া নন্দ ছুটিয়া আসিল। দেখা গেল তাহার বক্ষঃপটে সেই শ্রীবৎসপুচ্ছলাঞ্ছন কোমল রোমরাজি শোভা পাইতেছে। কিভাবে যে সীতাকে সংবর্ধনা করা যায়, নন্দ যেন ভাবিয়া পায় না। বহুতর আদরের নাম ধরিয়া সে তাহাকে ডাকিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার দেহ-মন সীতার দেহ-মনের জন্য তৃষিত হইয়া প্রতীক্ষারত ছিল। নন্দ বলিয়া চলিল :

'চন্দ্রবদন, খঞ্জননয়ন, তন্বঙ্গী, গৌরী, সুশ্রোণীযুতা, সুন্দরী সীতা! প্রিয়া আমার, বধূ আমার! তুমি কি এতদিনে পথ চিনিয়া আমার হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে! কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়াছে তোমার কথা ভাবিয়া। স্বপ্নে মনে হইয়াছে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া তুমি এই নিঃসঙ্গ নির্বাসিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিতেছ। অদৃষ্টের বিচারে যখন আমার পরাজয় ঘটিল, তখন আমি অভিমানবশত তোমার-আমার মধ্যে কত যে ব্যবধান রচনা

করিলাম— দস্যুতস্কর-অধ্যুষিত গিরিবর্ত্ম, হিংস্র শ্বাপদসংকুল বনপথ, ও সর্পসরীসৃপ-পরিবৃত মালভূমি। তুমি সে সকলই জয় করিয়া, অতিক্রম করিয়া, আসিলে কি! অহো, কি দুর্লভ আমার সৌভাগ্য। তোমার ন্যায় রমণীর তুলনা হয় না। সঙ্গে এ কাহাকে লইয়া আসিয়াছ?

সীতা বলিল :

'বিবাহের প্রথম রাত্রে, সেই যখন তুমি নন্দে পরিণত হও নাই, তোমার বীজ আমার মধ্যে উপগত হইয়াছিল। ইহা তাহারই ফল।'

'সে-বীজ কতটুকুই হইবে বা। আচ্ছা, ইহার নাম কি?'

'ইহার প্রকৃত নাম সমাধি। কিন্তু অধিকাংশ লোকে ইহাকে এখন অন্ধক বলিয়া জানে।'

'ইহার কারণ?'

'মনে করিও না সত্যই ও অন্ধ। গৌরবর্ণ সত্ত্বেও উহার ত্বক যেমন পাণ্ডুর, তেমনি দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও উহার নাম অন্ধক। তবে ও যে ক্ষীণদৃষ্টি, সেকথা সত্য— সম্মুখে তিন পায়ের বেশি উহার নজরে পড়ে না।'

'ইহা একপ্রকার মন্দ নহে।'

এত বলিয়া নন্দ বালককে কুটির হইতে কিছু দূরে লইয়া গেল। সবুজ ঘাসের উপর অন্ধককে বসাইল ও খেলিবার জন্য তাহার হাতে কিছু ফুল, ফল ও খাদ্যদ্রব্যাদি দিল। বালক খেলিতে লাগিল। চূতমঞ্জরীর গন্ধে তখন বসন্তের বাতাস আকুল। সূর্যস্নাত উপবনশীর্ষে তখন কোকিলকুল পঞ্চমে গান গাহিতেছে। প্রণয়কেলির এই অনুকূল অবসরে প্রণয়ীযুগল যে-খেলা খেলিল, তাহা অন্ধকের দৃষ্টিসীমার বাহিরে রহিয়া গেল।

॥ এগারো ॥

আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়, এই দুই প্রণয়ীর মিলন-মেলা এক দিন এক রাত্রির বেশী স্থায়ী হয় নাই। নন্দের কুটিরশীর্ষে শোভমান অগ্নিময় পলাশ-কিংশুক পুষ্পের উপর দ্বিতীয় দিনের সূর্য উদিত হইতে না হইতেই শ্রীদমন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। শূন্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার পত্নী কোন্ দেশে গিয়া থাকিবে। ধেনুকল্যাণস্থিত তাহার আত্মীয়-কুটুম্বেরা ত্রাসকম্পিত কণ্ঠে যখন সীতার অন্তর্ধানের কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিল, তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের শ্রীদমনের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিল না। পূর্ব হইতে সে যেন ইহা অনুমান করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে শিরঃ সঞ্চালন করিয়া নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিল ও নন্দের আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার মন নির্বিকার— ক্রোধ নাই, মোহ নাই, প্রতিহিংসাপরায়ণতা নাই। অবিশ্রাম সে চলিল। কিন্তু তাহার যেন কোনো ত্বরা নাই। আশ্রমের পথ সে নিশ্চিতরূপে অবগত ছিল। এতকাল সীতার নিকট সে-কথা গোপন রাখিয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে ত্বরান্বিত করার কী প্রয়োজন ?

শান্তমনে নতশিরে একটি চমরীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সে যখন নন্দের কুটির-সমীপে উপস্থিত হইল, তখন আকাশে শুকতারা উঠিতেছে। আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিকযুগলের প্রণয়সম্ভোগে সে বাধামাত্র দিল না। দিনমানে যখন তাহাদের আলিঙ্গনপাশ শিথিল হইবে ও তাহারা শয্যা ত্যাগ করিবে— সেই অপেক্ষায় ধৈর্যসহকারে বসিয়া রহিল। হতাশ প্রেমিকেরা যেমন হা-হুতাশ সহকারে বিচ্ছেদযাতনা

প্রকাশ করে, শ্রীদমনের ঈর্ষা সে-প্রকারের নহে। ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাহার এই চিন্তা ছিল যে, সীতা এক্ষণে যে-দেহের সহবাস করিতেছে, তাহা তাহার নিজের দেহ, এবং এই দেহের সঙ্গেই সীতা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা যেন একপ্রকার বিপরীতমুখী সতীত্বের প্রকাশ। প্রখর বস্তুজ্ঞান হইতে শ্রীদমন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের দুইজনের যাহারই অঙ্কে সীতা শয়ান হউক-না কেন, দুই জনের কোনো একজন বিশেষ সময়ে কার্যত তাহার আসঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সে স্বামী ও বয়স্য উভয়ের সঙ্গে একত্র রমণ করিত।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে নন্দের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিতে গিয়া সে কেন ত্বরার ভাব প্রকাশ করে নাই, কেনই বা সে ধৈর্যসহকারে প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত কুটিরের সম্মুখে নীরবে বসিয়া ছিল। এতৎ-সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ঘটনাস্রোত বাধাহীনভাবে বহিয়া যাইতে সে দেয় নাই। আখ্যান হইতে জানিতে পারি, সূর্যোদয়ের প্রথম মুহূর্তে অন্ধক যখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, সীতা ও নন্দ গামছা-গলায় কুটির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ও নিকটস্থ নদীতে স্নানে যাইবার পথে দেখিতে পাইল তাহাদের স্বামী-বয়স্য তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। সে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল, একবার পিছনের দিকে তাকাইল না পর্যন্ত। প্রণয়ীযুগল শ্রীদমনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনয়পুরঃসর তাহাকে সংবর্ধনা করিল। সাক্ষাৎমাত্র তাহারা বুঝিল, নন্দের আশ্রমে আসিবার কালে শ্রীদমন তাহাদের ত্রয়ী-সমস্যা বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং কিরূপে সেই সমস্যার সমাধান হয়, তদ্বিষয়ে এক চরম নিষ্পত্তিতে পৌঁছিয়াছে। মনে মনে তাহারা বুঝিল শ্রীদমনের যে-সিদ্ধান্ত তাহা অনিবার্য ও সর্বথাস্বীকার্য।

সীতা তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল .

'প্রাণনাথ শ্রীদমন, পতি আমার, স্বাগত তুমি, তোমাকে নমস্কার। মনে ভাবিয়ো না, তোমার এই আগমন আমাদের অবাঞ্ছিত কিংবা

ভয়ের কারণ। আমরা দুইজনে যখন মিলিত হই, তখন তৃতীয় ব্যক্তি তো অনুপস্থিত থাকিবেই। যদি অনুকম্পা-পরবশ হইয়া আমি নিঃসঙ্গ বয়স্য-মুখের সন্ধানে এখানে আসিয়া থাকি— আমাকে ক্ষমা করিয়ো।'

শ্রীদমন বলিল :

'যাহা বয়স্যমুখ তাহাই তো স্বামী-দেহ। সুতরাং হে সীতা, তোমাকে আমি মার্জনা করিলাম এবং নন্দ, তোমাকেও। তোমরাও আমাকে মার্জনা করিয়ো, কারণ আমার নিজস্ব অহং ভাবের প্ররোচনায় আমি তোমাদের বিষয় না চিন্তিয়া, সন্ন্যাসী কামদমনের বিচারক্রমে সীতাকে আপন অধিকার-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। অবশ্য ইহাও সত্য, সন্ন্যাসীর সিদ্ধান্ত যদি তোমাদের অনুকূলে যাইত, তোমরাও এই প্রকারই করিতে। অপ্রকৃতিস্থ আমাদের ইহজীবন বিরোধে বিসংবাদে এমনই কণ্টকাকীর্ণ যে, আমরা কেউ যখন আলোকের মুখে দাঁড়াই, তখন অপরের মুখে ছায়া আসিয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে যাহারা বিবেকবান, যাহাদের মন উন্নত, তাহারা আজীবন ব্যর্থ চেষ্টায় মাথা খুঁড়িয়া মরে। তাহাদের চেষ্টার লক্ষ্য আর কিছুই নহে— যেন একজনের আনন্দের হাসি অপর জনের দুঃখ ও ক্রন্দনের কারণ না হয়। তোমার দেহসম্ভোগের আনন্দ আমার মস্তকের সমস্ত চিন্তাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, আর মূর্খের মত আমি সেই মস্তককেই শরীরের শীর্ষস্থান জ্ঞানে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়াছিলাম। চর্চার অভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষীণতর হইয়া থাকিলেও—এই আমার বাহুদ্বয়ের দ্বারাই নন্দ সূর্যবন্দনার দিনে সীতাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করিয়াছিল। রূপান্তর যখন ঘটিল এই আনন্দ আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল যে, সীতার আনন্দদায়ক যাবতীয় বস্তু এক্ষণে আমার আয়ত্তাধীন। কিন্তু প্রেমের লক্ষ্যবস্তু হইল প্রণয়াস্পদের সমগ্রতা। সেই কারণে আমাদের সীতা আমার আলয় ত্যাগ করিয়া নন্দের মুখাকৃতির আকর্ষণে চলিয়া আসিয়াছে। যদি

জানিতাম আমার এই বয়স্যের মধ্যে সীতা চিরকালের নিমিত্ত তাহার পরম চরিতার্থতা লাভ করিবে, তাহা হইলে কোনো প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি ফিরিয়া যাইতাম ও আমার পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতাম। কিন্তু ইহার কোনো স্থিরতা নাই। স্বামীমুখসংপৃক্ত বয়স্যদেহ যখন তাহার অধিকারে ছিল, তখন সে বয়স্যমুখসংপৃক্ত স্বামী দেহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। নিশ্চিত বলিতে পারি, আবার স্বামীমুখসংপৃক্ত বয়স্য-দেহের প্রতি মায়াবশত সে যদি আমার নিকট ফিরিয়াও যায়, তাহার মনে শান্তি থাকিবে না, আনন্দ থাকিবে না। বহু দূরের পতি এই যে বয়স্যের নিকট তাহার মন পড়িয়া থাকিবে, এবং ইহারই নিকট আমাদের পুত্র অন্ধককে সে উপস্থাপিত করিবে। কারণ, ইহার মধ্যে সে তাহার পুত্রের পিতাকে দেখিতে পায়! কিন্তু আমাদের দুই জনের পত্নীরূপে সে তো বসবাস করিতে পারে না; সভ্যসমাজে বহুভর্তৃকার স্থান নাই। কেমন সীতা, আমি যাহা বলিলাম, তাহা কি যথার্থ নহে?'

সীতা কহিল:

'প্রিয় আমার, প্রভু আমার, তুমি যাহা বলিলে— হায়, সে সকলই সত্য। এই যে দুঃখপ্রকাশ-সূচক 'হায়' কথাটি বলিলাম, ইহার কারণ এমন নহে যে, বহুভর্তৃত্ব সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া আমার মনে তজ্জনিত অক্ষেপ রহিয়াছে। আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের পক্ষে বহুভর্তৃত্বের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না। বংশগৌরবের গর্ব আমার সহজাত—পিতা সুমন্ত্রের ঔরসে আমার জন্ম, আমার ধমনীতে কিঞ্চিৎ ক্ষাত্র রক্ত এখনও প্রবাহিত হইতেছে। বহুভর্তৃত্বের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর প্রথার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহ বোধ করে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার বাসনা যতই বলবৎ হউক না কেন, উচ্চবর্ণের লোক যাহারা, তাহারা কি সহজে জাতিগৌরব ও আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতে পারে?'

শ্রীদমন প্রত্যুত্তরে বলিল:

'তোমার নিকট আমি এইরূপ উত্তরই লাভ করিব বলিয়া আমার আশা ছিল। নারীসুলভ দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই ক্ষাত্র তেজের বিষয় আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। যেহেতু আমাদের উভয়ের স্ত্রীরূপে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব, আমি ও বয়স্য নন্দ কী করিতে পারি? আমরা উভয়ে উভয়ের সহিত শির অথবা শরীর অদলবদল করিয়াছি। এক্ষণে এই পরস্পরবিচ্ছেদ নিরসনের একমাত্র উপায় হইল পুনরায় পরমাত্মার মধ্যে আমাদের জীবাত্মাকে বিলীন করিয়া দেওয়া। যেখানে একই জীবাত্মা একাধিক অংশে বিভক্ত হইয়া বিকর্ষণের সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আপনাকে উৎসর্গ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।'

নন্দ বলিল :

'শ্রীদমন ভ্রাতঃ, সর্বান্তঃকরণে আমি তোমার এই-সকল কথা সমর্থন করি। আমার চিত্তে আর কোনো দ্বিধা নাই। এই শরীর হইতে কী আর আমাদের লাভ? আমরা তো সীতার সহবাস করিয়াছি। আমাদের কামবাসনা তো চরিতার্থ হইয়াছে। সীতাকে উপভোগ করিয়াছে তোমার চৈতন্যের মধ্য দিয়া যেমন আমার দেহ, তেমনই আমার চৈতন্যের মধ্য দিয়া তোমার দেহ। সীতাও তোমার প্রতীকযুক্ত আমার দেহ ও আমার প্রতীকযুক্ত তোমার দেহ হইতে যথোচিত আনন্দ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এতদ্দ্বারা আমাদের অসম্মান কিছু ঘটে নাই। তোমার শিরকে যদি প্রবঞ্চনা করিয়া থাকি তাহা হইলে সে তোমারই শরীরের সাহায্যে। অথবা, বলিতে পার নিতম্বিনী সীতা তোমার শরীরের সাহায্যে আমার শিরকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। সুতরাং সে একপ্রকার শোধবোধ হইয়া গিয়াছে। একদা আমাদের চির-সখ্যের প্রতিশ্রুতির সূত্রে আমরা তাম্বুলপান বিনিময় করিয়াছিলাম। ব্রহ্মার কৃপায় আমার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা পাইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, নন্দরূপে আমি ও সীতা যদি দেহে-মনে তোমায় প্রবঞ্চনা করিতাম, তাহা হইলে কী দুর্ভাগ্যই না হইত। তথাপি ইহা

বলিতেই হইবে যে, এইভাবে চলা তোমার আমার পক্ষে শ্লাঘাজনক হইবে না। আমরা সুসভ্য মানুষ, বহুভর্তৃত্ব কিংবা কামাচার আমাদের পক্ষে সংগত নহে। সীতা যে মার্জিতরুচিসম্পন্ন, সে কথা তো সহজেই বলা যায়। আমার দেহধারী হইলেও তুমি স্বয়ং এবং তোমার দেহধারীরূপে আমিও তো বর্বরোচিত আচরণ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন করা বিষয়ে তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। দেখ, এই নির্জন বনবাসকালে আমার দুই বাহু কেমন শক্ত হইয়াছে। আমি এই বাহুদ্বয় দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিব— পূর্বে একবার অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম— স্মরণ আছে তো? তুমি তো ইহাও অবগত আছ যে, তোমা অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকি এমন আমার অভিপ্রেত নহে। দেবীর সম্মুখে যখন তুমি আপনাকে বলি দিলে, আমি তো তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণে দ্বিধা করি নাই। আমি যদি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকি তাহা হইলে এই স্বামী-দেহের অধিকারগুণে। সীতা যে সমাধিকে আমার নিকট উপস্থাপিত করিল, সে তো এই দেহের স্বীকৃতিতে। দেহের দিক দিয়া আমি যে বালকের পিতা সে আমি কি করিয়া ভুলি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধা-সহকারে স্বীকার করি, এই পিতৃত্বের উদ্ভব হইয়াছিল আমার মাথায় নহে, তোমার।'

শ্রীদমন জিজ্ঞাসা করিল :

'অন্ধক কোথায়?'

সীতা বলিল :

'অন্ধক কুটিরের মধ্যে শুইয়া আছে— নিদ্রিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শক্তি ও সৌন্দর্য সঞ্চয় করিতেছে। তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে বিবেচনা করার ইহাই উপযুক্ত অবসর। আমরা আমাদের বিভ্রান্তি হইতে সসম্মানে কি-প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইব— এই চিন্তার চেয়ে অন্ধকের ভবিষ্যৎ-চিন্তা এক্ষণে আমাদের মুখ্য কর্তব্য।

অবশ্য তাহার সহিত আমাদের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে আমরা যদি নিজেদের মান রক্ষা করি তাহা হইলে অন্ধকের মানও রক্ষা পায়। তোমরা দুইজনে পরমাত্মায় বিলীন হইলে পর, যদি আমি তাহাকে লইয়া এই মর্ত্যে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে দুঃখে অপমানে জর্জর এই অনাথ সন্তানের জীবন দুর্বিষহ হইবে। পক্ষান্তরে, ভাবিয়া দেখ, সতীরা যখন পতিদের অন্তিমশয্যায় চিরতরে মিলিত হইবার জন্য চিতায় আরোহণ করেন, জগৎশুদ্ধ মানুষ তাঁহাদের স্মৃতি-রক্ষার্থ মন্দির-দেউল রচনা করে। আমি যদি সেইরূপ সসম্মানে সহমরণে যাই, তাহা হইলে লোকের সশ্রদ্ধ স্নেহদৃষ্টি এই বালকের উপর পড়িবে। সুতরাং সুমন্ত্রদুহিতা সীতারূপে আমার এই দাবি, যেন নন্দ আমাদের তিনজনের জন্য চিতাশয্যা রচনা করে। ইহজীবনে আমি তোমাদের উভয়ের সহিত সহবাস করিয়াছি। মৃত্যুকালেও যেন চিতার অগ্নিতে আমাদের তিন জনের দেহ মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।'

শ্রীদমন সোৎসাহে বলিল :

'যেমনটি চাহিয়াছিলাম, তুমি ঠিক সেইরূপ বলিতেছ। সূচনা হইতেই আমি জানিতাম, কামলিপ্সার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতর একটি উচ্চ আত্মসম্মানের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তোমার এই সংকল্পের জন্য আমাদের পুত্রের পক্ষ হইয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এক্ষণে ভাবা যাউক, দেহের মোহ আমাদিগকে যে দুরবস্থায় উপনীত করিয়াছে, তাহা হইতে সসম্মানে কিরূপে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি। এই নিষ্ক্রমণের উপায় নিরূপণ করিতে গিয়া আমি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা হয়ত তোমাদের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক হইবে। বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে মহৎ-হৃদয় নারী মৃত স্বামীর সহিত নিজেকে চিতাগ্নিতে বিসর্জন দিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু আমাদের দুইজনের একজন যত্তপি বাঁচিয়া থাকে ততকাল পর্যন্ত তো তোমার বৈধব্যদশা ঘটিতে পারে না। আমাদের সহিত জীবিত অবস্থায়

চিতারোহণ করিলে, তুমি বৈধব্যদশায় উপনীত হইতে পারিবে কি না তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তোমার বৈধব্য ঘটাইতে হইলে আমাদের উভয়কে আত্মহত্যা করিতে হয়, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের প্রাণ লইতে হয়। প্রাণ লওয়া ও আত্মহত্যা করা— আমাদের পক্ষে তো সমার্থক। হরিণীর জন্য পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হরিণেরা যেমন শৃঙ্গাঘাতে পরস্পরকে হনন করে, আমাদেরও তদ্রূপ করিতে হইবে। এই-সকল কথা ভাবিয়া আমি চমরীর পৃষ্ঠে তুইটি তরবারিও সঙ্গে বাঁধিয়া আনিয়াছি। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, একজন এই তরবারিযুদ্ধে জয় লাভ করিল ও অপর জন সুশ্রোণিযুতা সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। তাহা হইলে ভাল হইবে না। যে-ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেই বয়স্যের বিরহানলে সীতা তাহা হইলে প্রতি দিন আমরণ দগ্ধ হইতে থাকিবে। না, মরিতে হইবে আমাদের তুইজনকেই। একের তরবারি অপরের বক্ষ বিদীর্ণ করিবে। স্মরণ রাখিতে হয় যে, তরবারি অপরের, কিন্তু বক্ষ নিজেদের। আমার মনে হয়, শিরবিচ্যুত শরীরকে স্বহস্তে নিধন করা আমাদের পক্ষে সমুচিত হয় না। কারণ, বর্তমানে আমাদের শিরের সহিত যে-শরীর যুক্ত তাহা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের নিজের নয়। যে-শির আমার নহে তাহার বলে আমার শরীর যদি বৈধ পত্নী সম্ভোগে নিযুক্ত হয়— তাহা যেরূপ অন্যায়, তেমনই অন্যায় যদি আমার শির অপরের শরীরকে হনন করিতে উদ্যত হয়। এই যে আমাদের উভয়ের মধ্যে তরবারিযুদ্ধ, ইহা যদি মরণান্তিক না হইল তাহা হইলে সমস্তই বৃথা হইল। আমাদের পরস্পরের শির ও শরীরকে এমনভাবে এই যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে, যাহাতে উভয় অঙ্গের একটি যেন আত্মরক্ষার্থ কিংবা সীতাকে লাভের জন্য, যুদ্ধ না করে। উভয়কে মনে রাখিতে হইবে যে, এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মরণান্তিক আঘাত দান করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আঘাত গ্রহণ করা। আমরা তো একদা আপন আপন শির শরীর হইতে বিচ্যুত করিতে

দ্বিধা করি নাই। সুতরাং এই পারস্পরিক আত্মহনন আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না।'

নন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিল :

'দাও তোমার তরবারি, আমি প্রস্তুত। আমাদের এই প্রতিযোগিতার ইহাই সম্যক সমাধান। সম্যক বলিতেছি এই কারণে যে, শিরের সহিত শরীরের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া আমাদের ভুজদ্বয়ের বল প্রায় একই প্রকারের হইয়াছে, শ্রীদমনের বাহু আমার শরীরে শক্তিমান হইয়াছে। আমার বাহু শ্রীদমনের দেহে কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়াছে। আনন্দিতচিত্তে তোমার তরবারির মুখে আমার হৃদয় পাতিয়া দিব। আর তোমার হৃদয় আমার তরবারির আঘাতে আমি এমনই বিদীর্ণ করিব যে, সীতা যেন আর তোমার আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আমার কথা চিন্তা না করে, যেন আমাদের দুইজনের বিধবারূপে সীতা চিতাগ্নিতে সহমৃতা হইতে পারে।'

এই প্রকার ব্যবস্থায় সীতা প্রীত হইয়াছে— এইরূপ আভাস দিল, বলিল, ক্ষত্রিয় কন্যার পক্ষে এইরূপ মরণ সর্বাংশে শ্রেয়। সে স্থির করিল পলায়ন করিবে না—মরণান্তিক তরবারি-যুদ্ধের শেষ অবধি স্বচক্ষে দেখিবে। অন্ধক যে-কুটিরে শয়ান, তাহার সম্মুখে গোমতীর তীর ও পলাশ-কিংশুকের বন পর্যন্ত বিস্তৃত পুষ্পাবৃত প্রান্তরে, দুইজনের মধ্যে তরবারিযুদ্ধ হইল। পরস্পরের তরবারি পরস্পরের বক্ষ ভেদ করিল। দুইজনে একত্র চরম নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। পুষ্পাবৃত প্রান্তর ইহাদের বক্ষশোণিতে রক্তাভ হইল।

সীতা সহমৃতা হইবে এই সংবাদে নানা দিক-দেশ হইতে প্রচুর লোকসমাগম হইল। ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উৎসবের আকার ধারণ করিল। সকলের আগ্রহ অন্ধক কিভাবে মুখাগ্নি করে দেখিবে। পিণ্ডাধিকারীরূপে ক্ষীণদৃষ্টি অন্ধক চিতাশয্যার নিকট দাঁড়াইল। সহকার ও সুগন্ধ চন্দনে চিতা সজ্জিত। ফাঁকে ফাঁকে ঘৃতসিক্ত বিচালি দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে বিলম্ব না

হয়। অন্ধক ক্ষীণদৃষ্টি-হেতু চিতাশয্যার নিতান্ত নিকটে গিয়া মুখাগ্নি করিল। মহিষডালের সীতা চিতাশয্যায় আপন স্থান লইল স্বামী ও বয়স্যের মাঝখানে। অগ্নিশিখা লকলক করিয়া ঊর্ধ্ব আকাশে উঠিতে লাগিল। জীবিতের পক্ষে অগ্নিঝলসিত হইয়া মৃত্যু নিদারুণ কষ্টের। সুন্দরী সীতা যদি-বা সহমৃতা হইবার কালে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, ঢাক-ঢোল-শঙ্খ-ঘণ্টার মিলিত কলরবে তাহার কাতর ক্রন্দন শ্রুতিগোচর হইল না। আখ্যান বলে যে, দুই প্রণয়ীর সহিত সম্মিলিত হইবার বিমল আনন্দে, অগ্নিতাপ সীতার নিকট শীতল বলিয়া মনে হইয়া থাকিবে। ইহা আমরাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি।

সতী যে-স্থানে আপনাকে আহুতি দেয়, সেই পবিত্র স্থানে লোকে স্মৃতিসৌধরূপে দেউল রচনা করে। গোমতী তীরে এই প্রকার দেউল উঠিল। তিন জনের অস্থি একত্র সমাহৃত হইল। দুগ্ধে মধুতে স্নান করাইয়া মৃৎ-কলসের মধ্যে অস্থিসকল স্থাপন করা হইল ও সেই কলস ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। যথাকালে পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে এই অস্থিসকল বিসর্জিত হইল।

কিন্তু, সীতার গর্ভজাত সমাধি পিতৃমাতৃহীন হইলেও, তাহাকে কোনোপ্রকার দুঃখকষ্ট বা অসুবিধায় পড়িতে হইল না। অন্ধক নামে প্রসিদ্ধ সহমৃতা সতীর এই ক্ষীণদৃষ্টি সুগঠিত সুন্দর পুত্রটি, সকলের সমাদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল। দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ তাহার অতিক্রান্ত হয় নাই, তখনও তাহার মুখশ্রী ও দেহের শক্তি ও সৌষ্ঠব দেখিয়া লোকে বলিত যেন এক গন্ধর্ব মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ওই বয়স হইতে তাহার বক্ষে শ্রীবৎসপুচ্ছ-লাঞ্ছিত রোমরাজি উদ্‌গত হইতে আরম্ভ করিল। ক্ষীণদৃষ্টি তাহার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল না, বরঞ্চ দৃষ্টির এই দুর্বলতা-হেতু সে আপন দেহের দিকে ততটা দৃক্‌পাত করিল না যতটা করিল মনের দিকে। একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাত বছর বয়স হইতে

অন্ধককে মানুষ করার ভার গ্রহণ করিলেন এবং শুদ্ধ ও সংস্কৃত বাচন পদ্ধতি, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অন্ধক যখন বিংশবর্ষীয় যুবক, তখন হইতেই সে বারাণসী-রাজের রাজসভায় সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত। দুগ্ধধবল রেশমে প্রস্তুত চন্দ্রাতপের নীচে দুগ্ধধবল পরিচ্ছদে-উত্তরীয়ে সুসজ্জিত হইয়া সভাপণ্ডিত অন্ধক ধর্মশাস্ত্র কামশাস্ত্রাদি হইতে শ্রুতিমধুর সুকণ্ঠে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কাশীরাজকে শুনাইত। উৎসাহে উদ্দীপ্ত তাহার আয়ত চক্ষুদ্বয় ভূর্জপত্রের অতি নিকটে রাখিত, কারণ অন্ধক শৈশব হইতেই ক্ষীণদৃষ্টি।

মান্-এর নিজের কথায় 'মস্তক-বিনিময়' গ্রন্থটি হল 'দর্শনের পরিহাস'—'a metaphysical jest'। ভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসের দুই তরুণ নায়ক, শ্রীদমন ও নন্দ, যথাক্রমে অধ্যাত্মশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রতীক। এই দুই দ্বিধাবিভক্ত শক্তি যুগপৎ আকৃষ্ট হল নায়িকা সীতার প্রতি। সীতাকে মান্ দৈহিক সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কল্পনা করেছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-সম্মত একটি যৌনতত্ত্বের সমর্থনে সীতা তার প্রণয়ীযুগলের মস্তক বিন্যাসে এমন একটি ভুল করে বসল যার ফলে একের মুণ্ড গিয়ে বসল অপরের ধড়ে। অধ্যাত্মশীর্ষ যুক্ত হল জৈবিক দেহের সঙ্গে আর জৈবিক শীর্ষের পরিবাহক হল অধ্যাত্মদেহ। এই বিন্যাসবিপর্যয়ের ফল কিন্তু সীতার পক্ষে আশানুরূপ সুখকর হল না। মান্-এর অনবদ্য লেখনীর গুণে এই আখ্যানে একত্র বিধৃত হয়েছে অজন্তা গুহাচিত্রের লাস্যময় রহস্য ও মহৎ কাব্যের রসমাধুর্য। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনায় ও পরিহাসরসায়িত শ্লেষে ও সর্বোপরি যৌনতত্ত্বের বিদগ্ধ বিশ্লেষণে এই উপন্যাস অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ।